মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

ষোড়শ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

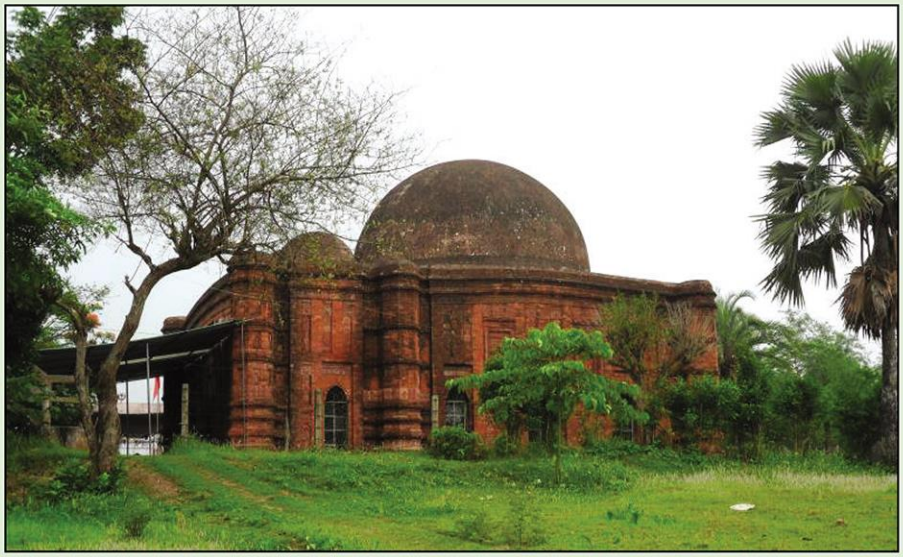

শংকরপাশা শাহী মসজিদ। হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার রাজিউড়া ইউনিয়নের শংকরপাশা গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৫১৩ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়া এই মসজিদটি নির্মাণ করেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মজলিশ আমিন; মসজিদের পাশেই আছে তার মাজার। কালের বিবর্তনে একসময় মসজিদ সংলগ্ন এলাকা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে জঙ্গলবেষ্টিত হয়ে পড়লেও পরবর্তীকালে এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠলে জঙ্গলে আবাদ করতে গিয়ে বের হয়ে আসে মসজিদটি। এটি একটি এক চালা ভবন। ভবনটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই মাপের, যা ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি। এর সামনের বারান্দাটির প্রস্থ তিন ফুটের সামান্য বেশি। এতে চারটি গম্বুজ রয়েছে। উপরের ছাদ আর প্রধান প্রাচীরের কার্নিশ বাঁকানোভাবে নির্মিত।

লাকুটিয়া জমিদার বাড়ি। মূল্যবান ইট, পাথর আর সুরকি দিয়ে গাঁথা এক সময়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান বরিশালের লাকুটিয়া জমিদার বাড়ি। শহর থেকে উত্তর দিকে বেশ খানিকটা দূরেই বাজার ছাড়িয়ে লাকুটিয়া জমিদার বাড়ির অবস্থান। প্রায় চারশ বছর পূর্বে রাজা রায়চন্দ্র রায় নির্মিত এ বাড়িটি বরিশাল বিভাগের অন্যতম পুরনো জমিদার বাড়ি। বাড়ির প্রবেশ পথে দৃষ্টিনন্দন মঠ এবং বাড়ির পাশে রয়েছে বিশাল দিঘি ও মাঠ। প্রায় এক একর জমি নিয়ে নির্মিত এই বাড়ির বেশিরভাগ স্থাপনাই আটচালা দেউল রীতিতে তৈরি। বাড়ির পেছনের অংশে শিখররীতির কয়েকটি মন্দির রয়েছে।

নবীন

ষোড়শ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

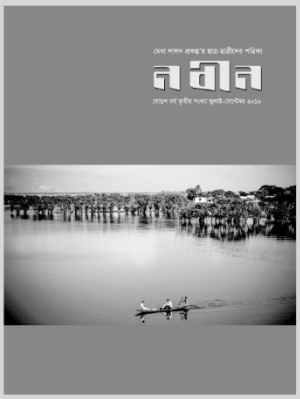

সূ | চি | প | ত্র

বাংলার খনা এবং কৃষি উন্নয়নে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ২
অপার সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত দিগন্ত আমাদের হাওর ৫
বাংলাদেশের পারমাণবিক অভিযাত্রা ৮
অংকুর ১০
জনসংখ্যা বোঝা নয়, দেশের সম্পদ ১১
সমাজের প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলার বিকল্প নেই ১৩
তারুণ্যের অবিনাশী অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধু ১৫
শ্বাসতন্ত্রের জটিল অসুখ আইএলডি ১৬
ইমার্জিং ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড পেলেন
বাংলাদেশের তানজিল ১৮
বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের সাফল্য
ক্যান্সার শনাক্ত হবে শুধু রক্ত পরীক্ষায়! ১৯
উপদেশ-কূপদেশ ২০
কীভাবে বুঝব আমার প্যাশন কোনটা? ২১
অ্যাক্সট্রা কারিকুলার এ্যাকটিভিটিজ কেন করব ২২
বিসিএস প্রস্তুতি: লিখিত পরীক্ষার ট্রাম্পকার্ড গণিত ২৫
অংকুর ২৭
প্রকল্প সংবাদ ২৮
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ২৯
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

বাংলার খনা এবং কৃষি উন্নয়নে আবহাওয়ার পূর্বাভাস

'বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও কৃষি উন্নয়নে আবহাওয়ার পূর্বাভাস' বিষয়টি অনেকের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে এই ভেবে যে বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে আবার আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কী সম্পর্ক? সম্পর্ক আছে এবং একজন আবহাওয়া ও জলবায়ুবিজ্ঞানী হিসেবে আমি গভীর সম্পর্ক দেখতে পাই।

একটু ভেবে দেখুন তো, বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্য হচ্ছে বচন, প্রবাদ, ছড়া, জারি ইত্যাদি। এখানে বিশেষভাবে আমি খনার বচনকে উল্লেখ করতে চাই। আজ থেকে শত শত বছর আগে একজন বাঙালি নারী একই সঙ্গে প্রবাদ রচনায়, জ্যোতির্বিদ্যায়, গণিতে ও বিজ্ঞানে, বিশেষ করে কৃষি উন্নয়নে আবহাওয়া পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে (যেটাকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানে বলে থাকি) কীভাবে পারদর্শী ছিলেন, তা আমাদের কাছে এখনো রহস্যময়।

কৃষিভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস-পদ্ধতি নিয়ে উন্নত বিশ্বে এখন হইহই-রইরই চলছে অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে আমাদের উপমহাদেশে আজ থেকে শত শত বছর আগেও এই কৃষিভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল।

প্রথমেই আসা যাক, এই ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস বলতে আমরা কী বুঝি এবং এটা কীভাবে করা হয়ে থাকে। এক কথায় ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাসে ঋতু মানে তিন মাসব্যাপী ঋতু, যেমন গ্রীষ্ম মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত। বর্ষা জুনের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত। শরৎ মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত। হেমন্ত মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এখন আমরা যদি বর্ষাকালে (অর্থাৎ জুনের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত) অঞ্চলভিত্তিক কোথায় কোথায় কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত বা বন্যা বা ঝড় হতে পারে, তা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ একটা আগাম পূর্বাভাস দিতে পারি, তাহলে কৃষিক্ষেত্রে একটা ব্যাপক উন্নতি লক্ষ করা যাবে। কারণ, বৃষ্টির পানি ঠিক সময়ে আসা-না আসার ওপর বাংলাদেশের কৃষি

অনেকাংশে নির্ভরশীল। শুধু বাংলাদেশ কেন, বৃষ্টির পানি ঠিকসময়ে আসা-না আসার ওপর পৃথিবীর অনেক দেশই নির্ভরশীল। জলবায়ুবিজ্ঞানীরা এখন ছয় মাস আগে এই ধরনের পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন।

ইদানীং এশিয়ার বহু দেশে এবং আফ্রিকার কৃষিক্ষেত্রে কৃষির ব্যাপক উন্নতির একটা বড় কারণ হচ্ছে এই ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাসের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি অপেক্ষাকৃত নতুন, ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু। শুধু কৃষিক্ষেত্রে নয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই পূর্বাভাস যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

এখন আসা যাক এটা কীভাবে করা হয়ে থাকে। এটা করা হয়ে থাকে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিবর্তন (স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া) ও বাতাসের প্রবাহ বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া ও দিক নির্ণয় করে।

এক কথায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়া বা গরম হয়ে যাওয়া অবস্থাকে বলি এল নিনো (El Nino) আর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া বা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া অবস্থাকে বলি লা নিনা (La Nina)।

বাংলাদেশে যেমন গ্রীষ্মকাল আর শীতকাল আছে, তেমনি প্রশান্ত মহাসাগরেরও নিজস্ব গ্রীষ্মকাল আর শীতকাল আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্মকালকে বলে 'এল নিনো' শীতকালকে বলে 'লা নিনা'। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর ৩ ভাগের ১ ভাগ জুড়ে আছে, কাজেই প্রশান্ত মহাসাগরে কিছু ঘটলে পৃথিবীজুড়ে তার প্রভাব পড়ে। তাই প্রশান্ত মহাসাগর গ্রীষ্মকাল পুরো পৃথিবীকে গরম করে দেয় এবং একইভাবে তার শীতকাল পুরো পৃথিবীকে ঠান্ডা করে দেয়। 'এল নিনো' এবং 'লা নিনা'ও পর্যায়ক্রমে আসতেই থাকে প্রশান্ত মহাসাগরে, তাই এটা বড় সমস্যা না। কিন্তু মাঝেমধ্যে এরা অনেক শক্তি সঞ্চার করে; সেই বছরগুলো বেশি সমস্যার।

'এল নিনো' (El Nino: EN) প্রতি ৩ থেকে ৭ বছরে একবার দেখা যায়। তা বিরাজমান থাকে প্রায় ১২ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বিস্তর পার্থক্য হয় (প্রায় +০.৫ থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তখন এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা এবং মাঝেমধ্যে পুরো পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে, 'লা নিনা' (La Nina: LN) হলো 'এল নিনো'র সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পার্থক্য হয় (প্রায়–০.৫ থেকে–৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া এই 'এল নিনো' ও 'লা নিনা'র প্রতি খুবই সংবেদনশীল।

এখন কথা হচ্ছে, যে বছর EN/LN হবে না, সেই বছর কী হবে? সেই বছর সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস করা হবে EN/LN ও তাপমাত্রার ওঠা-নামার ওপর নির্ভর করে, যা শুধু ০.৫ ডিগ্রি ওপরে বা নিচে হয়।

এই 'এল নিনো'র ফলে পৃথিবীর কোথাও কোথাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম হয়, কম বৃষ্টি পড়ে, কখনো কখনো খরা হয়, ঝড়ের উৎপাত বেড়ে যায় (যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটা হয়ে থাকে) আবার পৃথিবীর কোথাও কোথাও এর উল্টোটাও হয়। যেমন ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৯৭ সালে ভয়াবহ খরায় পতিত হয় বাংলাদেশ। ওই দুটোই ছিল EN বছর। আবার ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বড় বন্যা দেখা দেয়, ওই দুটি ছিল LN বছর। তবে পৃথিবীর অনেক দেশের আবহাওয়া EN/LN-এর প্রতি সংবেদনশীল না।

অন্যদিকে, 'লা নিনা' হলে ঠিক 'এল নিনো'র উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় পৃথিবীব্যাপী। অর্থাৎ গরমের জায়গায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠান্ডা ঠান্ডা, স্বল্প বৃষ্টির জায়গায় অতিবৃষ্টি ইত্যাদি দেখা দেয়।

গত ৫০ বছরে 'এল নিনো' হয়েছিল ১৭ বার এবং 'লা নিনা' হয়েছিল ১২ বার। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এ ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে বলে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন।

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের কারণে বিশেষ করে স্যাটেলাইট বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে বলা যায়, আমরা সাগর ও বাতাসের অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ করে EN/LN কবে হবে, কীভাবে হবে, কতটা শক্তিশালী হবে, তা প্রায় নয় মাস আগে ধারণা পাই এবং ছয় মাস আগে অনেকটা নিশ্চিত করে এবং তিন মাস আগে বলা যায় একেবারেই নিশ্চিত করে বলতে পারি। এটা নিয়ে বর্তমানে জলবায়ুবিজ্ঞানীরা বেশ গর্বিত।

How likely is flooding in ২০১৮? এই EN/LN-এর পর্যবেক্ষণের আলোকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে বন্যার আশঙ্কা কতটুকু–এ রকম একটি রচনা লিখেছিলাম গত বছর অক্টোবর মাসে। মূল বক্তব্য ছিল, এবার (অর্থাৎ ২০১৮ সালে জুন-আগস্ট মাসে) স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বন্যা হতে পারে বাংলাদেশ, তবে ভয়াবহ বন্যা (যেমন হয়েছিল ১৯৯৮ বা ১৯৮৮ সালে) হওয়ার আশঙ্কা কম বা নেই বলা যায়। এটাই ঋতুভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস। আমি এখনো আমার এই পূর্বাভাস নিয়ে আত্মবিশ্বাসী অবস্থায় আছি।

এখন আশা যাক খনার বচন প্রসঙ্গে। অসংখ্য খনার বচন যুগ যুগ ধরে গ্রাম-বাংলার জনজীবনের সঙ্গে মিশে আছে। আনুমানিক ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। অনেকে অবশ্য বলেন, খনার বচন রচিত হয় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। কিংবদন্তি আছে, গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাসে রাজ্যের কৃষকেরা উপকৃত হতেন বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া।

এই রচনাগুলো চার ভাগে বিভক্ত:

-কৃষিকাজের প্রথা ও সংস্কার। Traditional Agriculture

-কৃষিকাজ ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। Agriculture decision support systems

-আবহাওয়া জ্ঞান। Seasonal climate outlook (forecasts)

-শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ। Agricultural management and adaptations

আবহাওয়াসংক্রান্ত বচনগুলো যদি আমরা লক্ষ করি। যেমন–

চৈত্রেতে থর থর (March)

বৈশাখেতে ঝড় পাথর (April)

জ্যৈষ্ঠতে তারা ফোটে (May)

তবে জানবে বর্ষা বটে। (June-July)

ছড়াটি পুরোপুরো EN/LN-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঠিক এখানেও মার্চ মাসে জুন-জুলাই মাসে বৃষ্টি বা বন্যার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। একই

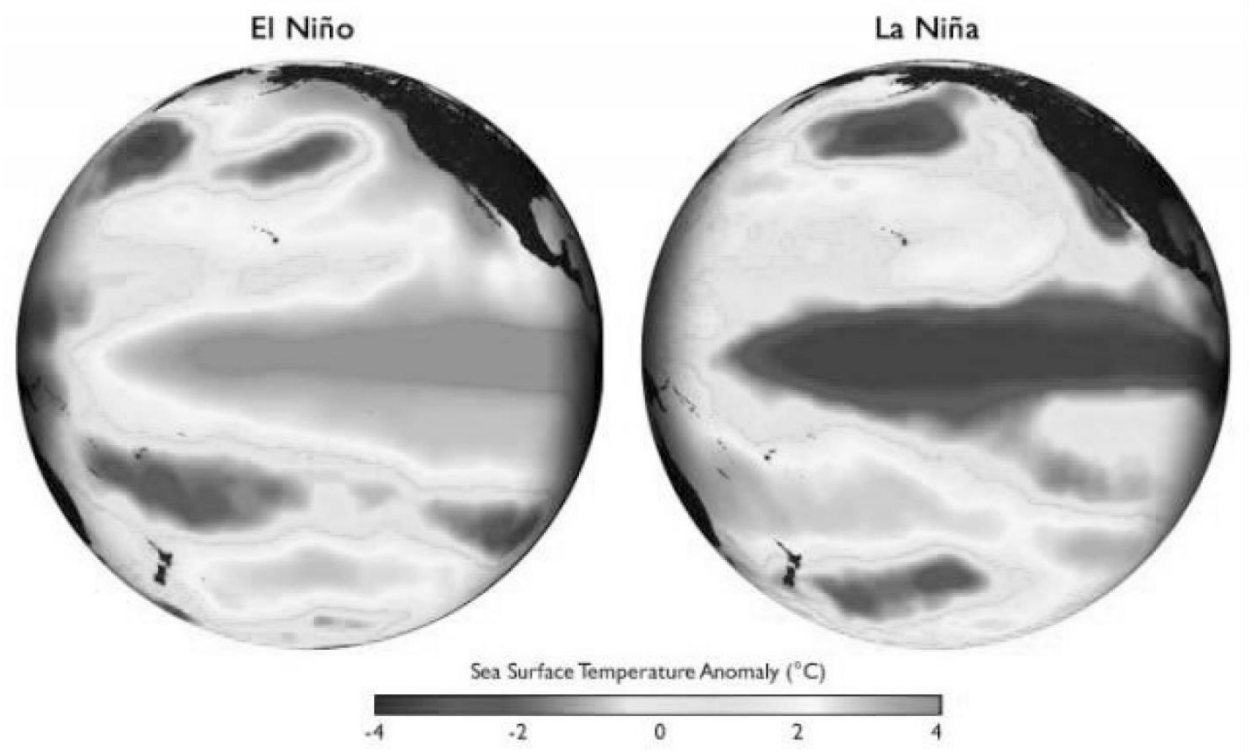

রকম আর একটি:
পূর্ব আষাঢ় দক্ষিণা বয় (June-Jul) (LN)
সেই বৎসর বন্যা হয়।

খনার বচন আজ আর কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় না বরং গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যের অংশ। খনার কিছু বাক্য পল্লিবাসীর জীবনের নিত্যসঙ্গী। 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' ইত্যাদি এখনো কৃষকেরা বিশ্বাস করেন। যখন আধুনিক কৃষিজ্ঞানের প্রসার ছিল না, তখন কৃষকেরা এসব থেকে উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু এ যুগেও এগুলো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক।

আমার কাছে খনার যে বিশেষ গুণটি (যুক্তিসংগত ও বিশ্বাসযোগ্য) এখনকার seasonal forecast তৈরির জন্য সবচেয়ে কার্যকর মনে হয়েছে, সেটি হলো তিনি ছিলেন একজন গণিতবিশারদ। তাঁর নিজের লেখা পাণ্ডুলিপিসহ গণিতের বই এখনো পাওয়া যায়। অনেকেই বলেন, তিনি খনা নয়, তাঁর নাম লীলাবতী। যদি তা-ই হয়, তাহলে গণিত সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং এই জ্ঞানই দরকার আবহাওয়া পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি আবহাওয়ার পূর্বাভাসে গণিতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

সুতরাং, যেভাবেই খনাকে বলা হোক না কেন, আমি অন্তত খনার অঙ্কবিদ্যার পারদর্শিতার কথা জেনে আশ্বস্ত যে একজন গাণিতিকের পক্ষে আবহাওয়া পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। খনার কর্মের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উনি শুধু পূর্বাভাস তৈরি করেননি, সেই জটিল তথ্য আবার সার্থকভাবে সহজ কবিতা বা বচনের মাধ্যমে প্রচার (disseminate) বা প্রকাশ করেছেন! এটা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়!

এই প্রচার করার বিষয়টি কিন্তু আমাদের জন্য বর্তমানে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বাভাসগুলো (information) অব্যবহৃত থেকে যায় শুধু প্রকাশের জটিলতার কারণে। পূর্বাভাস তৈরির বিষয়টি বেশ জটিল এবং আমরা এই তথ্যগুলোকে সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে প্রকাশ করতে এখনো সার্থক হইনি। অথচ কী সুন্দর সহজ সাবলীল ভাষায় কবিতা বা বচনের মাধ্যমে তখন তথ্যগুলো প্রকাশ করা হতো এবং এটাই ছিল খনার বচন বা পূর্বাভাসের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। আমার মনে হয়, এখান থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে।

খনার সহজ ছন্দের কথাগুলো বৃহৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এখনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দেরিতে হলেও যেহেতু আমরা ঐতিহ্যসচেতন জাতি, তাই আশা করা যায়, খনাকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হবে, আবিষ্কৃত হবে তাঁর যুক্তির বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, যেটা বিশেষ করে কৃষি উন্নয়নে আবহাওয়া পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে (seasonal forecast) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লেখক : আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ফ্যাকাল্টি এবং জয়েন্ট ইনস্টিটিউট ফর মেরিন অ্যান্ড এ্যাটমসফেরিক রিসার্চের প্যাসিফিক ENSO ক্লাইমেট সেন্টারের প্রধান বিজ্ঞানী।

রাশেদ চৌধুরী

প্রথম আলো, ০৭ জুলাই ২০১৮

অপার সম্ভাবনার প্রতিশ্রুত দিগন্ত আমাদের হাওর

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। আবার ভাটির দেশও বাংলাদেশ। আমাদের দিগন্ত বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড হাওরগুলো তাদের চৌহর্দি মিলে আমাদের ভাটির বাংলা বা ভাটি অঞ্চল গঠন করেছে। হাওর শব্দটির উৎপত্তিও সাগর থেকে সায়র; আর সায়র অপভ্রংশ হয়ে হাওর হয়েছে বলে ভাষা বিজ্ঞানীদের মত। হাওরের আছে ব্যাঞ্জরিত নাম। টাঙুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, শনির হাওর, টগার হাওর, মাটিয়ান হাওর, দেখার হাওর, হালির হাওর, সানুয়াডাকুয়া হাওর, শৈলচকরা হাওর, বড় হাওর, হৈমান হাওর, কড়চা হাওর, ধলা পাকনা হাওর, আঙ্গরখালি হাওর, নখলা হাওর, চন্দ্রসোনার থাল হাওর, ডিঙ্গাপুতা হাওর আরও কত নাম। ছোট ছোট নদী খাল নালা ডোবা আর বিস্তৃর্ণ এলাকাজুড়ে সীমাহীন বিল মিলিয়ে এ হাওরাঞ্চল ভাটির বাংলাকে যেন পরম মমতায় অপরূপ রূপে সাজিয়েছে এ বাংলার রূপকে। মাতিয়েছে প্রকৃতিকে। হাওরের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তন হয় ভিন্ন অবয়বে। বর্ষায় দিগন্ত জোড়া অথৈ জল উদ্দাম ঢেউয়ের অবিরাম মাতামাতি আর মন উদাসি মাতাল করা হাওয়া পর্যটকদের মন উদাস করে দেয় অহরহ। বর্ষার জলকেলি যিনি জীবনে একবার দেখেছেন তিনি বারবার ফিরে যাবেন হাওরের টানে। বর্ষায় যৌবনবতী হাওর সাগরের মতো অনন্ত অসীম জলাধারে একাকার। দূরের আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমানোর মনোরম দৃশ্য হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য বলে শেষ করার মতো নয়। হাওরে নৌকা ভ্রমণে চাঁদনি রাতের স্মৃতি জীবনে একবার গেঁথে নিলে আমৃত্যু তার তৃষ্ণা থেকে যাবে।

আর পাহাড়ের জলের তলে ভাটি বাংলার স্বর্ণগর্ভা সোনালি ফসলের দিগন্তজোড়া মাঠ ভেসে উঠে সুদিন শীতের প্রাক্কালে। বাংলার ষড়ঋতুর ঋতু বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য, লীলাখেলা এত সুন্দর ও প্রাণ জুড়ানো মাদকতা হাওর ব্যতিরেকে দেশের আর কোথাও দেখা যায় না। হাওর হচ্ছে ঋতু বৈচিত্র্যের চারণভূমি, লীলা নিকেতন। বাংলার আদি ও আসল রূপ অপরূপ হয়ে একমাত্র হাওরেই দেখা সম্ভব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরপুর, লোক সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের লালন, পালন, ধারণ ও বাহন করছে হাওর এলাকা। হাওরের দুটি রূপ। শুকনো মৌসুমের শীতকালে এবং বর্ষায় একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরিত রূপ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে জলে থৈ থৈ করা সীমাহীন জলাধারের হাওর হয়েছে রূপের রানী। হাওরের এ রূপ সাগরে অবগাহনের অপার সম্ভাবনা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে বারবার, এসো জলপুরীতে।

পৃথিবীর তাবৎ সুস্থ ও সুন্দর বিনোদন ও পর্যটন কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে পানিকে কেন্দ্র করে, পানির কিনারে কিংবা পানির মাঝে। পানিভিত্তিক আলো আঁধারের অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের কল্পনা বিলাসে নিয়ে যায় আলতো করে। পানি আর পানি। আর সে পানি যদি হয় মিঠা পানি, তবে তো সোনায় সোহাগা। হাওর হচ্ছে মিঠা পানির প্রকৃতি প্রদত্ত এক অপার মহিমা উৎস ও অবারিত জলভাণ্ডার। পুরো পৃথিবীর মাঝে মিঠা পানির এত বড় একক ওয়াটার বডি আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা জানা নেই। বর্ষার ৭ মাসে এর আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৫ হাজার বর্গমাইলের ওপরে। কোনো কুল নাই কিনার নাই এমন অবস্থা। চারদিকে পানি শুধু অথৈ পানি কেবল থৈ থৈ করে। প্রায় ২ কোটি লোক এখানে বসবাস করে। হাওর হচ্ছে সাগরেরই অপর প্রতিরূপ। সাগরের সব রূপ বৈশিষ্ট্য হাওরে রয়েছে শুধু সাগরের গহিন গভীরতা নেই।

দেশের পূর্ব-উত্তরাংশের কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৫৭টি উপজেলা নিয়ে ভাটির বাংলার হাওর এলাকা গঠিত। হাওর হচ্ছে একটা বিশাল চ্যাপ্টা বাটির মতো, বেসিন বিশেষ, যাতে বর্ষায় পানি জমে

সাগরের রূপ ধারণ করে। আর শুকনো মৌসুমে দিগন্ত জোড়া নয়নাভিরাম মাঠে সবুজ শ্যামলের সমারোহ। সবুজ ধান খেতের বুক চিড়ে বহমান সর্পিল মেঠোপথ বা ডুবা সড়ক কিংবা কৃষকের ব্যস্ত কর্মযজ্ঞ কার্যক্রম দেখার আকর্ষণ যে কাউকেই ঘুরে বেড়ানোর নেশায় মাতোয়ারা করবে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। সাগরের মতো বিশাল ও বড় বড় হাওরের মাঝে রয়েছে কচুরিপানার মতো ভাসমান দ্বীপ-গ্রাম। কাকের চোখের ন্যায় কালো ও স্বচ্ছ জলরাশির মাঝে দ্বীপের মতো এক একটি গ্রামের প্রতিবিম্ব সেরা আঁকিয়ের সেরা ছবি হয়ে ভেসে উঠবে আমাদের মনোজগতে। দূরে বহু দূরে বিরাগী দুপুরে কিংবা নিশুতি রাতে পানিতে কুপি বাতির নিবু নিবু আলোর নাচন অথবা জোনাকি পোকার মতো সৌরবিদ্যুতের আলোর ছটা মনটাকে বিমোহিত করবে ছাত করে আলোর বর্তিকা জ্বালিয়ে আমাদের মনের আঁধারী দুয়ারকে আলোকিত করে। মন পবনের নাও কিংবা সাধের ডিঙি নাওয়ে চড়ে নীরবে স্রোতের অনুকূলে ভেসে ঘুরে বেড়াতে মন চাইবে। যদিও এত প্রাণ রসের মধ্যে হাওরের গ্রামীণ জীবনের কষ্ট জাগানিয়া সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমাদের স্থবির করে দেয় ক্ষণিকের জন্য। এ স্থবিরতা বড়ই কষ্টের। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল কষ্টসহিষ্ণু হাওরবাসীর জীবন যাত্রা থেকেও জানা যায় অনেক অজানা কাহিনির কাব্যগাঁথা গল্পগাঁথা যা আমাদের অনন্য সুন্দরকে আরও মহিমান্বিত করে।

প্রায় ৮ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের হাওর এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে। ভাটির বাংলায় রয়েছে মোট ৩৭৩টি হাওর। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর, বছরে ধান উৎপাদন হয় ৫.২৩ মিলিয়ন টন যা আমাদের শস্য ভাণ্ডারকেই টইটুম্বুর করে না বরং আমাদের মোট খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও সমৃদ্ধ করছে পুষ্টিসম্মত করছে। হাওরে শস্য নিবিড়তা বা Crop intensity হচ্ছে ১৪৭%। জিডিপিতে হাওরের অবদান ০৩% এর ২৫% আসে কৃষি থেকে। হাওরে ৩% লোক ভূমিহীন (জাতীয় ১৪%)। ৮১% অকৃষিজীবীর কোনো কৃষি জমি নাই। হাওরে বছরে কৃষি জমি কমছে ০.৩৩% হারে। জাতীয়ভাবে যা ৭৪%। হাওর এলাকায় ৩৪% পরিবার প্রান্তিক কৃষক, ৫% পরিবার জাতীয় পর্যায়ের অনেক নিচে এবং ৫১% পরিবার ছোট কৃষক (জাতীয় ৪৯.৫%)। ২৮% লোক অতি দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।

হাওর আমাদের শস্যভাণ্ডার ও মৎস্যভাণ্ডার। হাওরের বিশাল জলরাশির মাতমে মাছের অবাধ প্রজনন বেড়ে উঠা, মৎস্য ঝিলিক এবং মাছভিত্তিক আমিষের অসীম জোগান নিশ্চিত মনে করিয়ে দেয় হাওর সাক্ষাৎ আমাদের মাতৃরূপী লক্ষ্মীদেবী মৎস্যদেবী। হাওরের মাছের খনি থেকে মণিকাঞ্চন আন মানি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহামূল্যবান ভাণ্ডারের মূর্ত প্রতীক রূপে। বছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের মাছ পাওয়া যায়। এসব মাছের মধ্যে আছে শিং, মাগুর, কৈ, পুঁটি, সরপুঁটি, তিতপুঁটি, খৈলসা, বাঁশপাতা, তাপসি, আইড়, বোয়াল, পাবদা, টেংরা, বাইম, চিতল, ফলি, ভেদা, গজার, শোল, মহাশোল, টাকি, চাপিলা, কাকিলা, রুই, কাতল, মৃগেল, কালো বাউশসহ ১৫০ রকমের বাহারি মাছের নিবিড়ভাণ্ডার। মাছ আর নবান্নের ধান কাটার উৎসব আগামী পুরো বছরের খোরাকি যোগানের মহাউৎসব দেখলে আনন্দাশ্রুতে চোখ ভিজে গাল বেয়ে টপ টপ করে গা শরীর ভিজে যায়। বছরের ৫ থেকে ৬ মাস আবাদি ফসল আবার ৬ থেকে ৭ মাস পানি থেকে রূপালি মাছ, হাঁসের মাংস আর ডিম আমাদের জাতীয় সমন্বিত পুষ্টি জোগানকে সচল রেখেছে হাওর। আমিষের ভাণ্ডার আরও শানিত করছে দিনের পর দিন। অকাল বন্যা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল এবং নানা কারণে সোনালি ফসল নষ্ট হয়। বছরের একমাত্র ফসলের ওপর ভর করেই চলে হাওরবাসীর পুরো বছর। হাওরের ৯০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজ করে ৫ ভাগ মৎস্য চাষি আর ৫ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। হাওরের জলাবদ্ধ ভূমিকে জারুল হিজল তমাল করচের সাথে জন্মে নলখাগড়া, ইকরা, জিংলা, বাঁশ ও প্রচুর বন সম্পদ।

ভরা বর্ষা হচ্ছে হাওরের যৌবনকাল একই সাথে নিদানকাল। চারদিকে পানি, শুধু পানি, থৈ থৈ করছে। টলমল, উচ্ছ্বাস জলে জলকেলি খেলে প্রকৃতি, পানির মধ্যে দাপাদাপি বড়ই আনন্দের। সমুদ্রের সাথে হাওরের পার্থক্য হচ্ছে সমুদ্রের গভীরে সাঁতার কাটা, ডুব দেয়া, মাছ ধরা বা ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু হাওরে এ সুযোগ অবারিত। ডুব সাঁতার দিয়ে কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলে পাতিহাঁসের সাথে পাল্লা দেয়ার কথা কি ভোলা যায়? একবার যারা হাওরের এ জলে অবগাহন করেছেন, বার বার তারা ফিরে আসে যেন কিসের এক অজানা আকর্ষণে। এখন আর রংবেরঙের পালতোলা সারি সারি নৌকা হয়তো হাওরে আর দেখা যাবে না। কিন্তু সাদা কালো ধোঁয়া তুলে ভটভট শব্দ করে পানি ছিটিয়ে, হাওরের বুক চিড়ে ইঞ্জিন চালিত কঠিন শক্তির পশরা দিয়ে গয়নানৌকার বা বেপারি নৌকার চলাচল নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা। বিয়ের বা বরযাত্রার নৌকা কলাগাছ আর রঙিন কাগজে সাজানো, সানাই বা বাদ্যযন্ত্র, মাইকের উচ্চ শব্দে, রাতে তা জেনারেটরের সাহায্যে আলোক সজ্জায় সজ্জিত চলমান আলোর নাচন বলেই মনে হবে। কচুরিপানা বা রাজহাঁস দলের ভেসে বেড়ানো অথবা প্রচণ্ড বড় ঢেউয়ের বিপরীতে আনন্দময়ীর যুদ্ধ করে ভিজে একাকার হয়ে হাতে প্রাণ নিয়ে ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে আগুয়ান হওয়া তাদের সংগ্রামী জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেবে।

জেলেদের টং বানিয়ে বান্দইরা জালসহ বিভিন্ন প্রকার জাল, বড়শি বা ডুব দিয়ে অথবা অমাবশ্যার রাতে হ্যাজাক লাইট কিংবা লণ্ঠনের আলোতে রাতভর কুঁচ-টোটা ডালা শিকারে মাছ ধরা বড় আনন্দের। কোথাও কোথাও জলিধান বা জলজ ঘাসে মাছের ঠোকরানোর ফলে নারার নাড়াচাড়া দেখে মাছের অবস্থান বুঝে কুঁচ দিয়ে নিরাগ মারার সুযোগও পেতে পারেন। হাওরের খোলা আকাশ, নির্মল মুক্ত বাতাস আপনাকে প্রশান্তি এনে দেবে। পলো দিয়ে মাছ ধরার মজাই আলাদা। লাফানো তাজা মাছ ভেজে খেতে পারেন। বিভিন্ন রকম নকশি আঁকা পিঠাপুলির জন্যও হাওর বিখ্যাত। বিখ্যাত নকশিকাঁথা ও কুটির শিল্পের বিকাশও সম্ভব। প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ববঙ্গকে উড়াল পঙ্খির দ্যাশ বলে অভিহিত করা হতো। হাওর এলাকাকে উড়াল পঙ্খির দ্যাশ নামেও ডাকা হয়। পুঁটি মাছে ঠোকর দেবার আশায় এক টেঙ্গে দাঁড়ানো ধ্যানমগ্ন ঋষি বক, গাংচিলের মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি, পানকৌড়ির ডুব, চিলের ছোঁ মারা, বিচিত্র রঙের, বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কিচির মিচির, ডানা ঝাপ্টার কানফাটা শব্দ শুধু হাওরেই শোনা সম্ভব। সুদূর সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীত হতে বাঁচতে, প্রজন্ম প্রসারিত করতে, ডিমে তা দিতে বা একটু উম তাপ নেয়ার আশায় উড়াল পঙ্খি অতিথি পাখিরা ছুটে আসে হাওরের প্রকৃতির

অবারিত গীতবিতানে। মেঘমুক্ত নীলাকাশে, সাঁঝবেলায়, মুক্তার মালার মতো দলবেঁধে জংলি পাখির উড়াউড়ি কেবল উড়াল পঙ্খির দ্যাশ নামে পরিচিত হাওরেই সম্ভব।

হাওরের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত নৌকা বাইচের তলাতে বিভিন্ন আকার, আকৃতির, রঙের 'দৌড়র নাও' এ মাঝিমাল্লা সোয়ারিরা রং বেরঙের পোশাক পরে, ডামি বাঘ, ভাল্লুক, হাতি ঘোড়া, মুখে সারিগান 'লাশারিক' আল্লাহ বলে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত। হাওরে পর্যটনকে কেন্দ্র করে এ ঐতিহ্যকে পুনঃর্জীবিত করার সুযোগ রয়েছে এখনও। আমাদের পার্বত্য এলাকা ও বিশ্বের অনেক স্থানে পেশাদার দল দিয়ে পর্যটকদের সামনে নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে। ময়মনসিংহ গীতিকার চারণভূমি হচ্ছে হাওর এলাকা। হাওরের আলো বাতাস, জলীয় পরিবেশ বর্ষার অফুরন্ত অলস সময় এবং বৈচিত্র্যের প্রাণান্তর মানসিকতা হয়তো মানুষকে ভাবুক করে সৃষ্টি করেছে অনেক জগত বিখ্যাত মনীষীদের। ভাটি-বাংলার বীর হিসাবে খ্যাত বীর ঈশা খাঁর মতো স্বাধীনচেতা মানুষ বা বর্তমান যুগসাধক শাহ আবদুল করিম, হাছন রাজার মতো মনীষীদের জন্ম এ হাওর ভাটি এলাকায়। হাওর কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে এগুলোকে লালন, পালন ধারণ করে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা নিলে কতই না ভালো হতো। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য উপজাতি কালচারাল একাডেমি হলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ২ কোটি হাওরবাসীর জীবন, কৃষ্টি, কালচার ও ঐতিহ্য রক্ষায় আবশ্যকীয়ভাবে কালচারাল একাডেমিসহ আরও সংশ্লিষ্ট কিছু হওয়া সময়ের দাবি। ড. দীনেশ সেন বা আর আমাদের প্রিয় লেখক ড. হুমায়ূন আহমেদ হাওরের কালচারাল খনি হতে কিছু মনি আহরণের চেষ্টা করেছিলেন। এতেই বিশ্ববাসী বিস্মিত, চমকিত এবং মাতোয়ারা। কিন্তু এর বিশাল ভাণ্ডার এখনও অনাহরিত রয়েছে অনেক কিছু। সংরক্ষণ না করলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে না চর্চায় কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। পর্যটন বিনোদনের অন্যতম উপাদান হতে পারে এরা এদের সংস্কৃতি ও সুন্দরের আবাহন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং হাওর উন্নয়ন বোর্ডকে হাওরের দিকে নজর ও গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে আসা দরকার জরুরিভাবে।

পানির মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত জারুল হিজল তমাল, জলজ বৃক্ষবাগ এবং জল পাখির উড়াউড়ি, আর মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি অবাক করে দেয় পর্যটকদের। বর্ষায় পানির মধ্যে পূর্ণিমা রাতে চাঁদের ঝিকিমিকি আলোর নাচন, পানি ও চাঁদের মিতালি, চাঁদের টানে পানি ফুলে ফেঁপে উঠা আপনার মনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে। ভাবুক হয়ে গেয়ে উঠবেন, মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না। বর্ষায় পানির চান কপাইল্ল্যা ঢেউ, আর শীতে সবুজ ধানখেতে বাতাসের ঢেউ ঢেউ খেলা বড়ই মনোমুগ্ধকর। চাঁদনি রাতে পালাগান, বাউলগান, ভাটিয়ালি, জারিগান, সারিগান, ঘাটুগান, যাত্রাদলের আসর, কীর্তন, লাঠিখেলা বা কিচ্ছার আসর, বাউলের বাহাস একসময় ছিল বেকার অলস বর্ষায় হাওরে নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় ঘটনা। পানসি নৌকা হয়ত এখন আর পাওয়া যাবে না কিন্তু বড় বড় গয়না নাও, ট্রলার, লঞ্চ বা স্টিমার জলযানে ভরা বর্ষায় পূর্ণিমার রাতে পরিকল্পিত নৌভ্রমণ রোমাঞ্চকর ঘটনা হবে। এত হরেক রকমের আয়োজন থাকবে।

দ্বিমুখীরা বলে থাকেন, আমাদের বিপরিতমুখী রাজনীতিবিদদের ভরা বর্ষায় পূর্ণিমার রাতে হাওরে ভাসমান জলযান সোনার তরীর খোলা ছাদে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেখবেন, তাদের মাঝে 'ভাব' হয়ে গেছে। শূন্য এ বুকে চারদিকে শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতো। হাওর পুত্র ড. নিয়াজ পাশার ভাষায়–স্বপ্ন দেখছি, হাওরে সোনার তরী, স্বপ্নডিঙা, ভ্রমণ হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধ ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় ভরপুর। নোঙর করবে এ স্বপ্নডিঙা, সমুদ্রের টিপ, সিংহল দ্বীপসম হাওরের কৃত্রিম ও পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট জলপুরিতে। পানিকে কেন্দ্র করে একে জলপুরি হিসেবে গড়ে বিনোদনের সব উপকরণ ও অবকাঠামো দিয়ে সাজানো হবে। জলপুরির পাশে পাখি ও মাছের জন্য অভয়ারণ্য তৈরি করে এগুলোর জীবন্ত চিড়িয়াখানায় রূপান্তর করা যায়। পর্যটকরা মন ভরে উপভোগ করবেন এর সৌন্দর্য, লীলাখেলা ও বিচরণ-আচরণ। পর্যটন বিনোদনের এত রসদ, রস, যশ, উপকরণ এক জায়গায় একত্রে একগুচ্ছে সহজে হাওর ছাড়া কি পাওয়া সম্ভব বাংলার কোথায়ও...?

সমুদ্রসম হাওরের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে গ্রাম বা উঁচু ভিটা সৃজন করে এ পুকুরে জলাশয়ে সারা বছর জল ও স্থলের বিভিন্ন স্তরে মাছ, হাঁস, মুক্তা, পাখি ও ফল-ফলাদি চাষের মাধ্যমে নতুন দিগন্তের নবযুগের শুভসূচনা হতে পারে অনায়াসে। হোটেল, মোটেল, আবাসিক জলযানসহ পর্যটনকে সামনে রেখে একে বিভিন্নভাবে সাজানো হবে। হাওর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক যুগোপযোগী করতে হবে। নৌভ্রমণ শেষে সপ্তডিঙা, স্বপ্নডিঙা, সোনারতরী, জলপুরি বিনোদন স্পটে নোঙর করবে। জমির সহজলভ্যতা, পলিউর্বর সোনার মাটি আর অবারিত মুক্ত পরিবেশের জন্য লোকজন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে হাওরে বসতি গড়েছিল। কিন্তু বর্তমানে হাওর হতে অভিবাসনের উল্টো স্রোতকে এর মাধ্যমে রুখে দেয়া সম্ভব হবে।

ঢাকার বড় বড় হাউজিং এবং এন্টারটেইনন্টমেন্ট সোসাইটিগুলো হাওরে সমন্বিত গ্রাম-জলপুরি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি হবে একটা লাভজনক আনন্দআশ্রম যা সুখ ও সমৃদ্ধির নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে যা প্রকৃত বিনিয়োগ হিসাবকে বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে আসবে। হাওরে এখনও কালের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধরে থাকা ঐতিহাসিক স্থাপনা ও অবকাঠামোগুলোকে নতুন সাজে সজ্জিত করে আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে। পর্যটন শিল্পের অপার সুযোগও এতে সৃষ্টি হবে।

পরিকল্পিতভাবে কম জীবনকাল উফশী ধানের চাষ, ভাসমান শাকসবজি আবাদ, নিয়ন্ত্রিতভাবে সেচ ব্যবস্থাপনা, মাছের অভয়আশ্রম গড়ে তোলা, জেলেদের আকাল সময়ে সাবসিডি প্রদান, পুরো হাওরকে পর্যটন উপযোগী করে গড়ে তোলার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেয়া, পরিকল্পিতভাবে হাঁস চাষ আমাদের অনেক দূরের বাতিঘরে নিয়ে যাবে। শুকনা আর ভেজা বর্ষার হাওর অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পরিকল্পিত বহুমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিলে খুলে যাবে অপার সম্ভাবনার দখিনা দুয়ার। যেমন হাওরের উদ্দাম ঢেউয়ের মতো ফুলে ফেঁপে উঠবে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্রোতের আর পুষ্টিসমৃদ্ধ হবে বাংলার মানুষ বাংলার সোঁদা মাটির জমিন।

কৃষিবিদ ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম
উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা
সূত্র : ais.gov.bd

বাংলাদেশের পারমাণবিক অভিযাত্রা

স্বপ্নের শুরুটা হয়েছিল সেই ১৯৬১ সালে। ঈশ্বরদীর রূপপুরে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল দেশ স্বাধীন হওয়ারও ১০ বছর আগে। ১৯৬২ হতে ১৯৬৮ সালের মধ্যে পদ্মা নদীর তীরে ঈশ্বরদীর রূপপুরকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের স্থান হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রকল্পের জন্য জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর দুরভিসন্ধিতে বাঙালির স্বপ্ন ধূলিসাত হয়ে গিয়েছিল। প্রকল্পটি পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেয়া হয়। স্বাধীনতার পর সীমিত সম্পদের মধ্যেও রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে সময় প্রকল্প পরিচালক পরমাণু বিজ্ঞানী এম ওয়াজেদ মিয়াকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী কাজও শুরু হয়েছিল। দুই দফা সম্ভাব্যতা যাচাই হলেও অর্থের যোগান না থাকায় প্রকল্পটি স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সুপারিশ করা হয়েছিল। তৎকালীন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম এ ওয়াজেদ মিঞার নির্দেশনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার পাওয়ার অ্যাকশন প্লানের অনুমোদন দেয়া হয়। ক্ষমতার পালাবদলে আবারও প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে যায়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এর ভিত্তিতে রাশিয়ার সঙ্গে 'সমঝোতা স্মারক' ও 'ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষরিত হয়। ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১১ সালের ২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে রাশিয়ান ফেডারেশন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রকল্প নির্মাণে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে পাবনার রূপপুরে দুই হাজার চারশ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য রাশিয়ার এটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সই করে বাংলাদেশ সরকার। ২০১৩ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ এবং প্রকল্প গ্রহণের ৫৭ বছর পর ৩০ নভেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নকামনেত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নিজ হাতে পারমাণবিক চুল্লি বসানোর জন্য প্রথম কংক্রিট ঢালাই/মূল নির্মাণ কাজ এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ ২য় ইউনিটের কংক্রিট ঢালাই/মূল নির্মাণ কাজের উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৩২তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়। চুক্তি অনুযায়ী এফসিপি উদ্বোধনের দিন হতে ৬৩ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ হওয়ার কথা।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২ হাজার ৪ শত মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পরিকল্পিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র–যা বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করবে। দ্রুত এগিয়ে চলছে দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঈশ্বরদীর পদ্মার পাড়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ। এটি শেখ হাসিনার ১০ অগ্রাধিকার মেগা প্রকল্পের একটি। সবকিছু ঠিকমতো চললে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। আর প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুই ইউনিট থেকে দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশি কর্মী মিলে প্রায় এক হাজারের বেশি কর্মী দিন-রাত কাজ করছেন। এ প্রকল্পের জন্য থ্রি প্লাস রিঅ্যাক্টর বসানো হচ্ছে। যেটি বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি। যা শুধু রাশিয়ার একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাইরে বাংলাদেশের রূপপুরেই বসানো হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিটে মূল স্থাপনার কাজ চলছে পুরোদমে। এটি নির্মাণে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার গাইডলাইন এবং আন্তর্জাতিক মান অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে। রাশিয়ার সর্বশেষ জেনারেশন থ্রি প্লাস প্রযুক্তির রিঅ্যাক্টর দিয়ে তৈরি হচ্ছে এ কেন্দ্র। পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা আছে এ রিঅ্যাক্টরে। রাশিয়ার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, আর্থিক সহায়তা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংস্থা আণবিক শক্তি কর্পোরেশনের (রোসাটম) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এএসই গ্রুপ অব কোম্পানিজ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পে রাশিয়ার উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক থ্রি প্লাস প্রজন্মের ভিভিইআর ১২০০ প্রযুক্তির পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহার করা হবে। প্রতিটি ১হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি ইউনিট স্থাপন করা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। দুই ইউনিটের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২৪০০ মেগাওয়াট। আগামী ২০২৩ সালে প্রথম ইউনিট এবং ২০২৪ সালে দ্বিতীয় ইউনিট চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে টানা ৬০ বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এরপর অতিরিক্ত আরও ২০ বছর উৎপাদন কাজ চলবে। এছাড়া এই প্রকল্পে ভবিষ্যতে আরও দুটি ইউনিট করার পরিকল্পনা রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জায়গা প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বর্তমানে ২২০০ কর্মী কাজ করছেন। এর মধ্যে রাশিয়ার বিশেষজ্ঞ রয়েছেন ৪৫০জন। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মূল কাজে যুক্ত হবেন ১২,৫০০ জন। এর মধ্যে রাশিয়ার বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ২৫০০ জন যুক্ত থাকবেন। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের ভারি মালামাল প্রকল্প এলাকায় পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশন থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ রেলওয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভারতের জিপিটি এবং বাংলাদেশের এসইএল ও সিসিসিএল অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২৯৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকায় ঈশ্বরদী বাইপাস টেক অফ পয়েন্ট থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ২৬ দশমিক ৫২ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ রেলপথ নির্মাণ করবে। এর মধ্যে ২২ দশমিক ০২ কিলোমিটার হবে মূল লাইন, আর ৪ দশমিক ৫ কিলোমিটার হবে লুপ লাইন। এছাড়া, ১৩টি লেভেল ক্রসিং গেট, একটি 'বি' শ্রেণির স্টেশন ভবন, একটি প্লাটফর্ম এবং সাতটি বক্সকালভার্ট নির্মাণ করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১৮ মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করবে। এই রেল লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর থেকে খুব সহজেই রাশিয়া থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আনা মালামাল পরিবহন করা সম্ভব হবে। প্রায় ১২শ' একর জমির ওপর নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃহৎ ও ব্যয়বহুল প্রকল্প। মূল প্রকল্প এলাকার বাইরে তৈরি হচ্ছে গ্রিনসিটি আবাসন পল্লী। পাবনা গণপূর্ত অধিদফতর এ কাজ বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি সুউচ্চ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০ তলা ১১টি বিল্ডিং এবং ১৬ তলা ৪টি বিল্ডিংয়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ২২টি সুউচ্চ ভবন তৈরি হবে এ চত্বরে। এছাড়া থাকবে মাল্টিপারপাস হল, মসজিদ ও স্কুলসহ বিভিন্ন স্থাপনা।

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? আর কতটুকুই বা নিরাপদ? জাপানের ফুকুশিমা আর চেরনোবিল দুর্ঘটনার ভয়াবহতা নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে এনেছে। জনগণের জন্য কোনো ঝুঁকি যাতে সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে গ্রহণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীসহ সব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষিত আলাদা একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। তাদেরকে রাশিয়া এবং ভারতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে রেখেই বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া তাদের সর্বশেষ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ভিভিইআর ১২০০ মডেলটি বাংলাদেশে দিচ্ছে। রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে সর্বশেষ আধুনিক এই মডেলটির। এছাড়া রোসাটোমের তথ্য অনুযায়ী এই মডেলটি যে কোনো ধরনের বিমান হামলা থেকেও রক্ষা পেতে সক্ষম। জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ইউরেনিয়ামের বর্জ্য রাশিয়া তাদের নিজেদের ব্যবস্থাপনায় ফেরত নিয়ে যাবে। আর নিরাপদ ও নির্ভরশীলতার ব্যাপারে রাশিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়কারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির মান অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে। তাই রাশিয়াকে উন্নত পরমাণু শক্তির পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে, বিশ্বের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো মাথায় রেখেই রাশিয়া তার সর্বশেষ মডেলের আধুনিকায়ন করে। সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই বাস্তবায়িত হচ্ছে রূপপুর প্রকল্প। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প দেশের জন্য অনেক বড় অর্জন। দেশের এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক, এটা আমরা চাই। বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে অচিরেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

শাহাব উদ্দিন মাহমুদ
লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক
dailyjanakantha.com, সেপ্টেম্বর ২৫ ২০১৮

অংকুর

পরিবেশবান্ধব

মো. সারোয়ার হোসেন

সদস্য নং ৪৭২/২০০২

ছোট পাটগাছ (চারাগাছ) বিশেষ করে এর পাতা এবং কুঁড়ি স্যুপ তৈরি করতে অ্যারাবিয়ানরা ব্যবহার করত; এমনকি বর্তমানেও আরব দেশসমূহে প্রচুর কদর রয়েছে। ফলে সারা বছরই আরবদেশসমূহ বামন আকৃতির পাটগাছ উৎপন্ন করে থাকে।

পাট থেকে যে সুতা তৈরি করা সম্ভব–এই নিয়ে মজার কাহিনি বর্তমান। যখন মানুষ 'পাট স্যুপ' তৈরি করত পরিপক্ক পাটকাণ্ড দিয়ে তখন দেখা যায় এতে আঁশ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এই ধারণাটিই প্রাথমিক।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পাটকে চেনেন কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন রক্ষক মি. উইলিয়াম রক্স বার্জ ১৬৯৬ সালে কিছু পরিত্যক্ত গুল্মোর মধ্যে। তখনকার দিনে পাটপাতা ও কুঁড়ি সবজি ও এনজাইম হিসেবে কেবল ব্যবহৃত হতো।

পাট হচ্ছে বহুমুখী এবং পরিবেশ বান্ধব জৈব-পচনশীল প্রাকৃতিক তন্তু। এশিয়াতে প্রচুর পরিমাণে পাট হয় বিশেষ করে, বাংলাদেশ, ভারত এবং চীন। তার মধ্যে বিশ্বের ৬০% পাট উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। এটি দ্রুতবর্ধনশীল নবায়নযোগ্য জৈবসার যা ১২০ দিনের মধ্যে পুরোপুরি বড় হয়ে ওঠে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশ এবং ভারত মিলে বিশ্বের ৮৪% পাট তন্তুও চাহিদা পূরণ করে। পাট ব্যবহার করা হয় গৃহস্থালি ও খামার ব্যবস্থাপনায়।

শত শত বছর ধরে পাট আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। উনবিংশ শতাব্দীতে সিংহভাগ কাঁচা পাট ইংল্যান্ডে রপ্তানি হতো এবং এ থেকে ৮০% বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো। যখনই পলিথিন এবং সিনথেটিক বস্তুসামগ্রী পাটের স্থান দখল করতে শুরু করে, আমাদের সোনালী আঁশ আন্তর্জাতিক বাজারে মার খেয়ে গেল। বহু বছর ধরে আমাদের কৃষকরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। অনেক পাট ব্যবসায়ী হতাশ, এমনকি অলাভজনক বিধায় ব্যবসা চালাতে নারাজ। পাট সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সরকারি কর্তৃপক্ষ এ খাতে অর্থায়ন বন্ধ করে দিতে শুরু করল। আমাদের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ–পলল মাটির দেশ। পাট চাষ উপযোগী বর্ষার মৌসুম বাংলাদেশে। ভালোমানের পাট উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো পাট পঁচনে সংরক্ষণশীল পানির প্রাপ্যতা। যদিও ঐতিহ্যবাহী পাট উৎপাদন কমে গিয়েছিল কয়েক বছর ধরে, নতুন করে আবার পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব ও জৈব-পচনশীল দ্রব্যের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল ও উন্নত বিশ্বে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার বিরূপ প্রভাবের কারণে পরিবেশগত দিক দিয়ে পাট ও পাটজাত বস্ত্রাদি শুধুমাত্র বাস্তু সংস্থানের জালকে সুবিন্যস্তই করছে না, উপর্যুপরি পরিবেশ ও বায়ুমণ্ডলকে নিরাপদ করছে সরাসরি। আর এরই ফলে পাটশিল্পের উন্নয়নের নতুন দিক উন্মোচিত হলো।

ধান কাটার পর, ফসলি জমিকে পাট চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বিকল্প ফলন কমায় বর্জ্য, আগাছা, পোকামাকড়, পেস্ট। আবার, পাট চাষ মাটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও উর্বর করে। পাট গাছের কাণ্ডে অনেক

রসাল পাতা থাকে। গাছ যত বড় হতে থাকে পাতা তত নিচে পড়তে থাকে। অধিকাংশ পাতা ও পাটগাছের গুঁড়ি পচে মাটির সাথে মিশে যায়–যা জৈবসার হিসেবে মাটিকে উর্বর করে। শুধু তাই নয়, পাট ফলনশীল জমিতে কেঁচোর মাত্রা (earthworm) বেড়ে যায়। কেঁচো তৈরি করে প্রচুর পরিমাণ vermicompost, এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফসলের জন্য পুষ্টি (Nutrients)। তাছাড়া কেঁচো মাটিকে নরম করে রাখে পালভেরিজেশরে মাধ্যমে। অন্যান্য অনুজীব উপকারী পোকামাকড় ও অনুজীবগুলো এই সময় খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। একজন কৃষককে রাসয়নিক সার ব্যবহার করতে হয় না পাট ফলনশীল জমিতে।

ধানের সাথে তুলনা করলে পাট বেশি পরিবেশবান্ধব। একজন কৃষকের পাট উৎপাদন করতে খুব বেশি রাসায়নিক সার লাগে না। বর্তমানে তাঁরা বীজ বপণের সময় সামান্য পরিমাণে টিএসপি ও ইউরিয়া ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া পাটগাছে প্রচুর পরিমাণ সবুজ পাতা আসে এবং ঝরেও পড়ে ও প্রচুর মাত্রায় কার্বন-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে যা কমিয়ে ফেলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া।

পাট চাষ পরিশ্রম সাধ্যের কাজ। এর বহুল অর্থনৈতিক অবদান রয়েছে। পাটকাঠি গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাট হচ্ছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সবজিজাত তন্তু তুলার পরপরই; শুধুমাত্র চাষাবাদের দিক থেকে নয় বরং এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের দিক থেকেও এটি একটি শক্তিশালী সুতা।

এর ব্যবহার : কাপড় তৈরি, কাঁচা তুলার মোড়কে, হেসিরান কাপড় তৈরিতে, বস্তা তৈরি, কার্পেট শিল্প।

অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে, পাল্প এবং পেপার ইন্ডাস্ট্রি, ফার্নিচার এবং বেডিং ইন্ডাস্ট্রি, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি।

জিও টেক্সটাইল (Geotextile) তৈরি পাটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

পাটের কাপড় ব্যবহৃত হয় মাটি ক্ষয় প্রতিরোধে, বীজ রক্ষণে, আগাছা প্রতিরোধে এবং আরও অন্যান্য কৃষি ও স্থলভাগের দৃশ্যে: জমিতে পাটচাষ যেন মরুকে উদ্যানে রূপান্তরের নামান্তর প্রক্রিয়া।

বর্তমান জরিপে পাট তার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরে পেতে চলেছে। আন্তর্জাতিক মার্কেটে কাঁচা পাটের দাম অগের চেয়ে ৫০%-এর বেশি বেড়েছে এবং কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে (প্রায় ৮০০-৯০০) টাকা মণ। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বেও ৯০% কাঁচা পাটের যোগান দেয় এবং ৬০% পাটজাত বস্ত্রের যোগান দেয়। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৩ কোটি লোক রপ্তানিজাত পাট সেক্টরের সাথে সরাসরি জড়িত।

নবীন জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যা থেকে নেওয়া

জনসংখ্যা বোঝা নয় দেশের সম্পদ

আমাদের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও অমিত সম্ভাবনা রয়েছে যা এ দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য চাই বৈশ্বিক ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগী সুদূরপ্রসারী সঠিক পরিকল্পনা ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন। ১১ জুলাই ছিল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। অতিরিক্ত জনসংখ্যা সম্পদ নয়, বোঝা। অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ, বেকারত্ব, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এবার পালিত হয়েছে ২৯তম বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়েছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো–'Family Planning is a Human Right' (পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার)। ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে উন্নীত হয়। এর ফলে ইউএনডিপি'র গভর্ন্যান্স কাউন্সিল প্রতিবছর দিনটিকে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

সখিনা বেগম ছয় সন্তানের মা। থাকেন রাজধানীর তেজগাঁওয়ে, রেললাইন বস্তিতে। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র চলে যান। ফলে সাতজনের সংসার সামলানোর পুরো ভার এসে পড়ে সখিনার ওপর। কিন্তু এতে ক্ষোভ নেই। বস্তির অদূরেই কারওয়ান বাজারে সবজি বিক্রি করে সংসার চালান। সখিনা বলছেন, আমার ১০টা পোলাপাইন হইলে কী ফালাইতে পারতাম?

একই বস্তির আরেকজন শিউলি, সেও একাধিক সন্তানের মা। মনে করেন, অধিক সন্তান কোনো সমস্যা নয়। পোলাপান মানুষ করতে পারলে সম্পদ। এহন সবতো মানুষ হয় না। দুয়েকটা অমানুষও হয়। হাতের পাঁচ আঙুল কী সমান হয়? অবশ্যই এই ধারণার সঙ্গে একমত নন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত খন্দকার ফাইজুস সালেহীন। যিনি গত বছরই বিয়ে করেছেন এবং তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সালেহীন বলছেন, তারা

বাস্তবিক কারণেই এক সন্তানের পক্ষে।

বাংলাদেশে তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতার পর ধ্বংসস্তূপ থেকেই দেশটির পথচলা শুরু। ছিল না অবকাঠামো, ছিল না কোনো প্রতিষ্ঠানও। স্বাধীনতার পর থেকে অজস্র বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। একসময় বিশ্বে দুর্ভিক্ষে জর্জরিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয় ছিল, যা এখন ইতিহাস। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। সামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলোতে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশের।

যেমন শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার বেড়েছে অনেক। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় প্রকৃতঅর্থে তিনগুণ বেড়েছে, আর গড় আয়ু ১৯৭১-১৯৭২ সালের ৪৭ বছর থেকে ২০১৭ সালে ৭২.০৫ বছরে উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে দেড় শতাংশে নেমে এসেছে। গণসাক্ষরতার হার দ্বিগুণ হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন বিস্ময়। জনসংখ্যার বিচারে আমাদের দেশ অষ্টমস্থানে রয়েছে। কোথাও কোথাও আবার নবমও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) এর হিসাবে আমাদের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২৭ লাখ এবং বিশ্বের জনসংখ্যা ৭৫০ কোটি। আমাদের দেশের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন (ডব্লিউএইচও)-এর হিসাবমতে, প্রতি মিনিটে ২৫০টি শিশু জন্মগ্রহণ করে আর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ৯টি শিশু। এক জরিপে দেখা গেছে যে, বর্তমানে জন্মগ্রহণকারী ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৯৭ জন জন্মগ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এমনিতেই দেশগুলো অধিক জনসংখ্যার দেশ। সেদিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে এখন রোল মডেল বলে মনে করে।

বাংলাদেশ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জিডিপি অর্জনকারী দেশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৭.৪ শতাংশ। বিবিএস'র হিসাবে এরই মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৬৫। অতএব চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি প্রাথমিক হিসাবে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে জনশক্তিকে আরও দক্ষ করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তরুণ যুব বেকারদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তাদের কাজে লাগাতে হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সিংহভাগ অঞ্চলের মাটিই উর্বর ও আবাদযোগ্য। তাই আমাদের কৃষিক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা আমাদের জন্য সহজ। কৃষি, খাদ্য এবং জন্মনিরোধে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কৃষিকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি বলা হচ্ছে। দেশের ৮০০ থেকে ৯০০ কোম্পানি নিজস্ব উদ্যোগে সফটওয়্যার তৈরি করে রফতানি করছে। পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও সুযোগ-সুবিধা পেলে সফটওয়্যার রফতানিও তৈরি পোশাকের মতো বেকারত্ব দূর করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

এ মুহূর্তে বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সের মানুষ বেশি, যারা কর্মক্ষম। দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, জনশক্তি রফতানির প্রক্রিয়া সহজিকরণসহ সহজশর্তে ঋণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। যার জন্য দরকার সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে রয়েছে উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার পরিকল্পনা একটি প্রযুক্তি, যেখানে উন্নয়নের পূর্বশর্তকে বিবেচনায় রেখে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এটি মানবতার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কায়রো সম্মেলনে (১৯৯৪) জনসংখ্যা ও স্থিতিযোগ্য উন্নয়নের অব্যাহত ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচিতে উন্নয়নধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে–যার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য, চাকুরি এবং জনগণের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেন। সে আলোকে ১৯৭৬ সালে প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের বাণীতে বলেন, 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সকলকে দলমতনির্বিশেষে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস জনসংখ্যা সমস্যা উত্তরণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিসম্পন্ন ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।' এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জনসংখ্যা সমস্যা থেকে উত্তরণে আমরা সচেতন।

বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি দম্পতির তথ্য সংগ্রহ করা এবং দম্পতি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন তথা গ্রাম পর্যায়ে সর্বত্র এখন ডিজিটাল সেবার আওতাধীন। পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ এবং সকল উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য একটি মৌলিক ও মূখ্য এজেন্ডা।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সাফল্য অনুকরণীয়। আমাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার। সরকারি-বেসরকারিভাবে আমরা যদি উন্নয়নের স্বার্থে সুপরিকল্পিতভাবে সুসংবদ্ধ, সুসংকল্পবদ্ধ, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও কঠোর পরিশ্রমী হতে পারি তবে জনশক্তি দিয়েই আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

■ মুহাম্মদ ফয়সুল আলম
২৫ জুলাই ২০১৮, dhakanews24.com

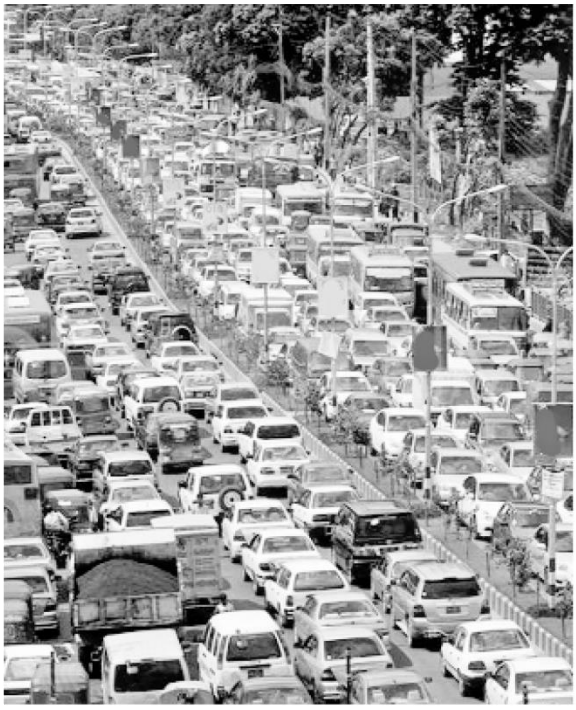

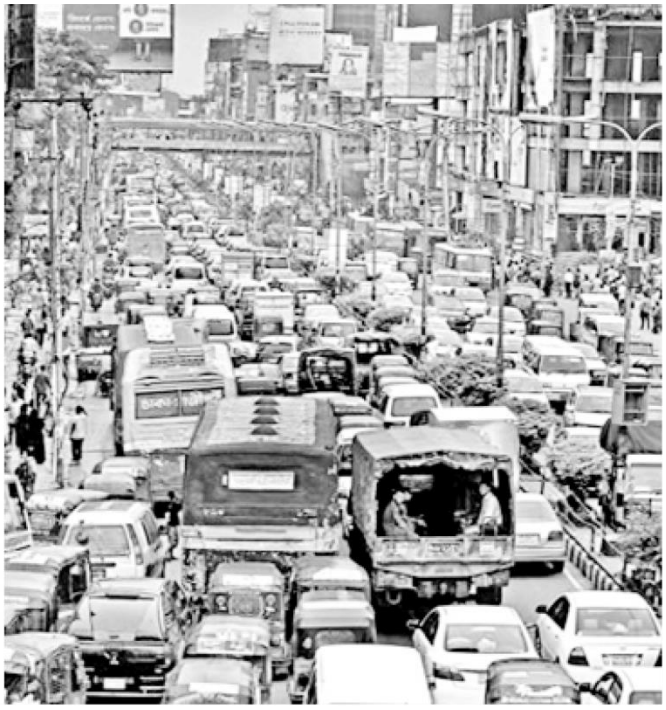

সমাজের প্রতিটি স্তরে শৃঙ্খলার বিকল্প নেই

বাইশ-তেইশ বছর আগের কথা। আমার একজন জাপানিজ সহপাঠীর নাম ছিল ওকাদা মাসাকি। সে বাংলাদেশকে খুব পছন্দ করত। একটি সেবামূলক সংগঠনের সদস্য হিসেবে তাই মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসত। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি দেশে আসতে পারিনি। শুনলাম ওকাদা এবারো বাংলাদেশে বেড়িয়ে এসেছে। সাপ্তাহিক ছুটিতে আমরা অনেকে একসঙ্গে দূরের একটি বড় জিমে ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতাম। সেদিন খেলার পর ওকাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাংলাদেশ ট্যুর কেমন হলো? সে বলল–অন্য সবকিছু ভালো কিন্তু তোমাদের দেশে রাস্তায় তো চলাচল করা যায় না। দিন দিন ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় তেমন কোথাও ট্রাফিক সিগন্যাল নেই। এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

সে যেটা বলেছিল তা সঠিক। কারণ, ঢাকায় তখন কিছু সিগন্যাল বাতি থাকলেও সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজ করতে দেখা যেত না। ট্রাফিক সিগন্যাল না থাকা আসলেই ভীষণ বিপজ্জনক বিষয়। কিন্তু তখন ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম ছিল না। আমি ওকাদার কথা শুনে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। আমার নীরবতা দেখে সে আবার প্রশ্ন করেছিল–তোমাদের দেশে বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে, মার্কেট হচ্ছে, গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু রাস্তায় কেন শৃঙ্খলা নেই? রাজপথে ইশারা ট্রাফিক দিয়ে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। একটা বেদনা কুরে কুরে খেয়েছিল সেদিন।

মনে মনে ভাবছিলাম আমাদের গাড়ি আছে, গতি আছে। কিন্তু সে গাড়ি কখনো বেগতিক হলে তা নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা নেই। সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে। ভূমিকম্প হলে বা আগুন লাগলে বেরুবার অথবা ফায়ার-অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার পথ নেই বা রাখা হয়নি। সহজ এন্ট্রি আছে কিন্তু সহজেই এক্সিট হবার পথগুলো কণ্টকাবৃত। দায়িত্ববানরা সবসময় ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

একজন ধনী ব্যবসায়ী বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী একসঙ্গে কয়টি সরকারি ও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন তার হিসাব কে রাখেন? কার কয়টি বাচ্চা কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য অনৈতিকভাবে কয়টি সরকারি গাড়ি দৈনিক কত ঘণ্টা ব্যবহার করছেন ও কত লিটার জ্বালানি অবৈধভাবে খরচ করছেন সরকার সে হিসাব নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, কারণ হিসাব নিতে গেলে বিপদ হতে পারে।

সেদিন শুনলাম যাত্রাবাড়ি থেকে মোহাম্মদপুর আসতে এক আত্মীয়ের রাস্তায় পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়েছে। বেপরোয়া বাস চালাতে গিয়ে ছাত্র নিহত হওয়ায় রাস্তা বন্ধ ছিল। অদ্যাবধি দেশের রাস্তায় কোনো আধুনিক সিগন্যাল নেই। হাতের ইশারায় সিগন্যাল চালু থাকায় এবং সিসি ক্যামেরা না থাকায় ড্রাইভারদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনার কোনো ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। তাই ড্রাইভাররা রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে ফুটবল খেলার মতো

ওভারটেক শুরু করে। সবাই যাত্রী ধরতে আগে দৌড়ায়। বাসগুলোতে সিরিয়াল নম্বর টাঙানো থাকে না, তারা মানেও না। সিরিয়াল ভেঙে আগে দৌড়াতে গিয়ে সম্প্রতি শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সামনে মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে! অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রাফিক নেই বা তারা ব্যস্ত থাকেন অন্য কাজে।

ঢাকায় চলতে গিয়ে দিন-রাত যেভাবে রাস্তায় বসে থেকে বন্দিজীবন কাটাতে হয় এবং গাড়ির ফুয়েল-গ্যাস অপচয় করা হয় তাতে আমার মনে হয়, রাজধানীর বাসিন্দাদের জন্য নতুন গাড়ি কেনা বন্ধ ঘোষণা করে বাইসাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক করা উচিত। আর কোনো ফ্লাইওভার নয়, ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর জাপানের ওকিনাওয়ার মতো হাল্কা ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হোক। নিচে মানুষ শুধু হেঁটে চলাচল করবে এবং হেঁটে ক্লান্ত বোধ হলে সিঁড়ি দিয়ে ট্রেনে উঠে সারা শহরে যেতে পারবে। ঢাকায় ট্রাফিক জ্যাম কমাতে হলে গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এজন্য মাইগ্রেটরি মানুষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একদিকে যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করব আর অন্যদিকে নিত্যনতুন বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কেট, বাহারী হাসপাতাল ও গার্মেন্টস খুলে ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে গাড়ি রেখে দেব–তা তো হতে পারে না। যার স্বার্থে আঘাত লাগে লাগুক বৃহত্তর জনস্বার্থে ঢাকায় ট্রাফিক জ্যাম কমাতে অতিসত্ত্বর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও গার্মেন্টসগুলোকে জেলা শহরে বা উপকূলীয় সমুদ্রবন্দর এলাকায় পাঠানো হোক। জনবহুল রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত সৌখিন মার্কেটগুলো ৪০ বা ৫০ কিমি দূরে সরিয়ে দেওয়া হোক। কারণ, বিলাসী গাড়ির মালিকরাই এর সিংহভাগ ক্রেতা, তাঁরা একটু দূরে গিয়ে লং ড্রাইভ করে হাওয়া খেয়ে খেয়ে শপিং করে আরো আনন্দ পেতে পারেন।

সারা বিশ্বে এমনই সুব্যবস্থা রয়েছে। যেমন–ওয়ালমার্ট, জাসকো, সানকি, কেএস, স্কটসডেল, লেকউড, গ্যালারীয়া, অ্যালামোনা সেন্টার, কিং অব পার্সিয়া, বজপার্ক, ওয়েষ্টফিল্ড, সুরিয়া, বারজায়া, মারকাটো ইত্যাদি বিখ্যাত শপিং মলগুলোর শুধু কিছু জরুরি ফুড ও ওষুধ ছাড়া বৃহৎ কেনাবেচার আয়োজন মূল জনবহুল সিটি সেন্টার থেকে অনেক দূরে। শহরের একঘেঁয়েমি রোধে সেসব জনপদের মানুষ গাড়ি চড়ে কেনাকাটা করতে বহুদূরে চলে যান। আর আমাদের দেশে সব কাজের জন্য সবাই উল্টো ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে আসেন। কাজেই যানজট তো হবেই। আর নিকট ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া বন্ধ না হলে আরো ভয়ঙ্কর মানুষজট ও যানজট হবে।

যানজট, জনজট ছাড়াও বর্ষাকালীন জলজটে ন্যুব্জ রাজধানী ঢাকা এখন কার্যত স্থবির নগরী। ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কার কথা এ পর্যায়ে বাদ দিলাম। পত্রিকায় প্রকাশ, কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকায় নাকি খাবার পানি পাওয়া যাবে না! কী ভয়ঙ্কর কথা!

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, দেশের বেশিরভাগ মানুষই নীতি-সিগন্যাল অমান্য করে অনিয়ম-নীতিহীনতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের এসব অনিয়ম-নীতিহীনতা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। যেমন, ট্রাফিক অব্যবস্থা দূরীকরণেও বহুবার বহু প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। ডিএমপি-র তথ্যানুযায়ী, ২০০১-০২ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ঢাকার ৫৯টি রাস্তার ৭০টি ইন্টারসেকশনে আধুনিক সিগন্যালবাতি চালু করা হয়েছিল। সেটা কাজে লাগেনি। আবার ২০০৯ সালে নতুনভাবে ট্রাফিক সিগন্যালিং সিস্টেম চালু করা হয়। সেটা ক'দিনের মাথায় ভেস্তে যায়! পরে ২০১৫ সালে সোলার প্যানেল দিয়ে ৬২টি ক্রসিংয়ে কম্পিউটারাইজড সিগন্যালিং বসানো হয়। এসময় প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। কিন্তু সেটাও ক'দিনের মাথায় 'পে-অফ' করতে ব্যর্থ হয়! ঢাকায় 'ইন্টিলিজেন্ট ট্রাফিক' চালুকরণ সম্পর্কিত এক সেমিনারে অনেক উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও অজানা কারণে তা হয়ে উঠছে না। কেউ কেউ বলেন–ঢাকায় 'ইন্টিলিজেন্ট ট্রাফিক' সিস্টেম চালু করা কঠিন কাজ। এক জরিপে দেখা গেছে–এই ধরনের ট্রাফিক সিস্টেমের চেয়ে এখানকার সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো বেশি 'ইন্টিলিজেন্ট'। কারণ, পদচারীরা সিগন্যাল মানে না, রাজনৈতিক সাইনবোর্ড ২৫% সিগন্যালবাতিকে ঢেকে আড়াল করে রাখে, গাছ ৩৩%, ডিশ ও ইন্টারনেট ক্যাবল ১৬%, বৈদ্যুতিক পোল ৮% সিগন্যালবাতিকে ঢেকে রাখে। 'ইন্টিলিজেন্ট' মানুষগুলোর ৯৭% লেন মানে না ও অন্যান্য শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, ৯৮% স্টপ লাইনে থামতে চায় না। এছাড়া অধুনা চালু হওয়া মোটর বাইকগুলো ট্রেন-বাস আসতে দেখার পরও লোহার ব্যারিকেডের নিচে মাথা ঢুকিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে চলে যায়। ডিএমপি-র এক তথ্যানুযায়ী আরও জানা যায়, ঢাকা শহরে দৈনিক চার হাজার ট্রাফিক পুলিশ নিয়োজিত থাকেন। এরা শব্দ ও বায়ুদূষণের শিকার হয়েও স্বল্প বেতনে হাতের ইশারায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে পছন্দ করেন। অনেকে মনে করেন, এখানে কষ্ট বেশি, তবে আয়ও বেশি!

এই তো সেদিন শিশুকিশোররা রাজপথ কাঁপিয়ে গেল! তাদের প্রভাবে গত কিছুদিনে ট্রাফিক বিভাগ রাজপথে যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট অন্যায়-অনিয়মের জন্য লক্ষাধিক মামলা রুজু করেছে। জরিমানা আদায় করেছে কয়েক কোটি টাকা! এটা ট্রাফিক বিভাগের দায়িত্ব ছিল যা এতদিন গুরুত্বের সঙ্গে করা হয়নি। এই টাকাগুলো শিশুদের স্কুলের টিফিনে ব্যবহার করা হোক। কারণ, সম্প্রতি দেশের সব স্তরের মানুষ শিশুকিশোরদের কর্মকাণ্ডে আস্থা খুঁজে পেয়েছিল।

ও হ্যাঁ, সহপাঠী ওকাদা বলেছিল রাস্তার সিগন্যাল বাতি না থাকার কথা। আজ আমাদের সমাজে যে মহা-গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতেও সিগন্যাল বাতি কার্যকর নয় তা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে বলাই বাহুল্য।

তাই এখন রাস্তায় অনেক সিগন্যালবাতির প্রয়োজন এবং সেগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগছে কি-না তার সুষ্ঠু তদারকির প্রয়োজন। আমাদের সমাজে শধু একজন ট্রাফিক পুলিশের অংগুলি নির্দেশনা বা কারো অদৃশ্য হাতের ইশারায় নয়, বরং বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত সবার জন্য নিবেদিত স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল এদেশের প্রতিটি স্তরে আশু দেখতে চাই এবং সেভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মকেও চলতে শেখাতে চাই। যেটা দ্রুত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আনবে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সততার ভিত্তিতে সামাজিক সমতা সৃষ্টি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

ড. মো. ফখরুল ইসলাম
ইত্তেফাক, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন
সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান

তারুণ্যের অবিনাশী অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধু

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা, যার নেতৃত্বে আমরা মহান স্বাধীনতা পেয়েছি তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শুধু কোনো দলের আদর্শ নন। তিনি সমগ্র বাঙালির, প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষের, প্রতিটি তরুণের অনুপ্রেরণা। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত একজন তরুণ কখনোই আদর্শচ্যুত হয়ে দেশের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে না। কাজেই প্রতিটি তরুণের উচিত এই মহান ব্যক্তির আদর্শ ধারণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

রাজনীতি যখন রাজার নীতিতে পরিণত, তরুণরা যখন হতাশায় নিমগ্ন, কাকে অনুসরণ করবেন, রাজনীতিতে কেউ কি আছেন যিনি যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণাযোগ্য তখন যে নামটি আসে তা হলো বঙ্গবন্ধু। তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বই থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধু জীবনে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তা হলো 'সিনসিয়ারিটি অব অনেস্টি' এবং 'সিনসিয়ারিটি অব পারপাজ'। কোনো ব্যক্তি যখন সততা এবং কোনো কাজে সৎ উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেন তাহলে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গবন্ধুর এই শিক্ষা আমরা ধারণ করতে পারি।

একজন তরুণের প্রথম দায়িত্ব জ্ঞানার্জন তারপর সমাজসেবা বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ করা। বঙ্গবন্ধুও তরুণদের এই উপদেশটাই দিতেন। তিনি বলেন, 'পড়ো, জানো, শেখো, বোঝো। তারপর বিপ্লবের কথা বলো। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা টেরোরিজম কইরা হয় না। মানুষ মরতে পারে কিন্তু নীতি বা আদর্শ মরে না কোনোদিন।' যখন আমরা জানতে পারি ছোট্ট শিশু বঙ্গবন্ধু তার গরিব বন্ধুকে ছাতাদানের কথা, এলাকার মানুষদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দুস্থদের মাঝে বিতরণ কিংবা আজীবন অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীনতার কথা তা কি আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় না? এ কারণেই তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে, 'যেখানে অন্যায়, অবিচার, শোষণ আছে, বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য সেখানেই আমি হাজির।'

বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের অন্যতম দিকগুলো হলো তার অসাম্প্রদায়িকতা, কর্মপ্রিয়তা ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য রাজনীতি করা। তিনি সারাজীবন রাজনীতি করেছেন মানুষের দুঃখ বেদনায় তাপিত ও মথিত হয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী এক ভাষণে বলেন 'এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।' এজন্যই তিনি বঙ্গবন্ধু, বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে আমরা আরও দেখি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়েছেন, কাজের চাপে অসুস্থ হয়েও কিভাবে কর্ম পালনে পিছপা হননি, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা কিভাবে তার মনে পীড়া দিয়েছে সেসব বিষয়।

একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে সত্য স্বীকার করে নেওয়ার মানসিকতা। বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখি এ কে ফজলুল হক তার বিরোধী দলে থাকার সময় তিনি শেরে বাংলার দূরদর্শী কর্মকে স্বীকার করতে। যে ব্যক্তিটি মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ মনে করে সদা বাংলাদেশের মানুষের পাশে ছিলেন, দেশের জন্য জীবনের অর্ধেকই জেলে কাটিয়েছেন অথচ সেই মহান নেতাকেও জীবনের অন্তিমকালে সপরিবারে বিপথগামী কতিপয় ব্যক্তির বর্বরোচিত শিকারে পরিণত হতে হয়েছে ১৫ আগস্ট, ১৯৭১-এ।

একজন ব্যক্তির ভালো খারাপ দুটো দিকই থাকতে পারে। সবার প্রত্যাশা থাকে ভালোর পাল্লাটাই ভারী হয়। তবে ভালো খারাপের উর্ধ্বে বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেম যেন সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। তাকে একক কোনো দলের আদর্শ হিসেবে সমালোচনা নয়। বন্দুকের নলে নয় বরং জনগণের বলে ক্ষমতায় বিশ্বাসী এই নেতা সমগ্র বাঙালির। প্রতিটি তরুণের উচিত বঙ্গবন্ধুর বর্ণিল কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও জীবন আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া। আসুন এই শোকের মাস আগস্ট থেকেই জাতি, দল, মত নির্বিশেষে প্রতিটি তরুণ জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচলের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করি।

এমদাদুল হক সরকার

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ আগস্ট ২০১৮

শ্বাসতন্ত্রের জটিল অসুখ আইএলডি

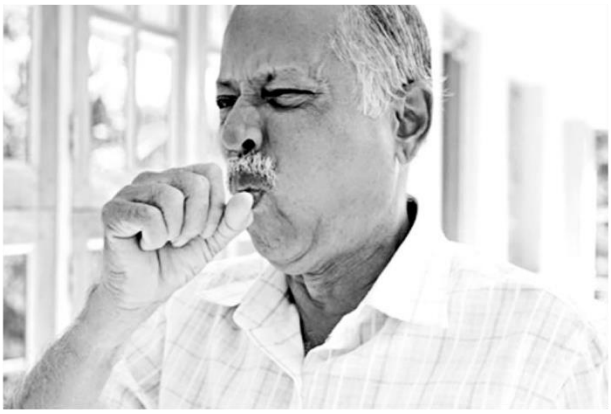

ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ বা আইএলডি হলো ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী প্রায় ২০০ রোগের সমাহার। এর ফলে রোগীরা তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগে। ক্রমান্বয়ে জটিলতার দিকে যেতে থাকে। তবে শুরুতে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিলে ভালো থাকা যায়। লিখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররফ হোসেন

ফুসফুসের বায়ুথলির চারদিকের শূন্যস্থান ও টিস্যুর (যেমন–এথভিউলার এপিথেলিয়াম, ক্যাপিলারি এনডোথেলিয়াম, বেসমেন্ট মেমব্রেন ইত্যাদি) সমন্বয়ে অসংখ্য জালের মতো নেটওয়ার্ক রয়েছে, যাকে বলে ইনটেস্টিটিয়াম। এই ইনটেস্টিটিয়াম অতি সূক্ষ্ম বায়ুকণা ধারণ করতে পারে। ভেতরে থাকা রক্তপরিবাহী নালির মাধ্যমে বাতাস থেকে রক্তে অক্সিজেন স্থানান্তর হয়। এসব স্থানে যেসব রোগ হয়, তাদের একত্রে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ। দুই শতাধিক রোগ এই আইএলডি গ্রুপে রয়েছে। কেউ এই রোগে আক্রান্ত হলে তার ইনটেস্টিটিয়ামের মেমব্রেন বা দেয়ালগুলো বেশ মোটা হয়ে যায়। তখন দেহে অক্সিজেন সরবরাহে বাধা পেয়ে ফুসফুস অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে যেতে থাকে।

বাংলাদেশে ৫০ বছরের উর্ধ্ববয়সীদের এ রোগ বেশি দেখা যায়। রোগটি নারীদের চেয়ে পুরুষের বেশি হয়। ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টের কারণেই রোগী মারা যায়। অনেক সময় এ রোগের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সারও দেখা যায়। রোগীরা সাধারণত শ্বাসকষ্টজনিত রোগ বা হাঁপানি মনে করে একে গুরুত্ব দেন না, যে কারণে প্রচুর রোগীর মৃত্যু হয়।

কারণ

বিভিন্ন কারণে আইএলডি হতে পারে। এর মধ্যে আবার অজানা কারণও রয়েছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক উদ্দীপকের মাধ্যমেই সব সময় ফুসফুসের ক্ষতি হয়। এই উত্তেজক দেহের ভেতরের বা পরিবেশের–দুই ধরনেরই হতে পারে। সিগারেটের ধোঁয়া, ধূলিকণা, ওষুধ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অটোইমিউন ডিজিজ যেমন–এসএলই ইত্যাদি এই উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

এলভিউলার এপিথেলিয়াল কোষ আহত হলে সেখান থেকে গ্রোথ ফ্যাক্টর নিঃসৃত হয়। এই উপাদান ফাইব্রোব্লাস্ট বিভাজন, মাইয়োফাইব্রোব্লাস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই মাইয়োফাইব্রোব্লাস্ট থেকে কোলাজেন নিঃসৃত হয়। এভাবেই ফুসফুসের ক্ষতের মেরামতপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। সাধারণত এই মেরামতপ্রক্রিয়া ফুসফুসের ক্ষত নিরাময় করে ফুসফুসের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখে। তবে জেনেটিক প্রবণতা, অটোইমিউন ডিজিজ নানা কারণে ফুসফুসের ক্ষত মেরামতে বিচ্যুতি ঘটে। এতে ফুসফুসে ফাইব্রোসিস হয়ে থাকে।

শ্রেণিবিভাগ

এই রোগগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

নিশ্বাসবাহিত জৈব পদার্থ

ফুসফুসে নিশ্বাসের সঙ্গে বিভিন্ন এন্টিজেন প্রবেশ করে হাইপারসেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস করে থাকে। এন্টিজেনের ওপর ভিত্তি করে এই রোগ কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

বার্ড ফ্যানসিয়ার লাং : পাখির পালক ও বিষ্ঠায় যে এভিয়াম প্রোটিন থাকে, তা পাখিপ্রেমীদের ফুসফুসে বার্ড ফ্যানসিয়ার লাং রোগ সৃষ্টি করে এই রোগ ধরায়।

ব্যাগাসোসিস : আখের ছোবড়ার ফাংগাস ব্যাগাসোসিস রোগ সৃষ্টি করে।

কৃষকের সমস্যা : ঘাসের কণা, ছত্রাকের স্পোর ও অন্যান্য কৃষিকাজে ব্যবহৃত কেমিক্যাল থেকে এই রোগ হয়।

এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার : এখানে ছত্রাক সৃষ্টি হয়, যা নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে এই রোগের সৃষ্টি করে।

নিশ্বাসবাহিত অজৈব পদার্থ

সিলিকসিস : ভূত্বকের ৭৫ শতাংশ উপাদান তৈরি করে সিলিকা বা বালু। সিলিকা ধূলিকণার মতো নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে ফুসফুসের সিলিকসিস রোগ তৈরি করে।

এসবেসটোসিস : বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, বিল্ডিংয়ের অগ্নি প্রতিরোধক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌল এসবেসটোসের আঁশ ফুসফুসে গিয়ে প্রদাহ তৈরি করে এই রোগের সৃষ্টি করে।

বেরিলিয়সিস : ফ্লোরেসেন্ট বাল্ব, মহাকাশ বা এরোস্পেস যন্ত্রাদি উৎপাদনে বেরিলিয়সিস ব্যবহৃত হয়। বেরিলয়াম নামক অজৈব পদার্থ ফুসফুসে ঢুকে রোগের সৃষ্টি করে।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : বিভিন্ন ড্রাগ বা ওষুধের কারণে আইএলডি হতে পারে। বিশেষ করে সাইটোটক্সি-ব্লিওমাইসিন, সাইক্লোফসফ্যামাইড, বিউসালফ্যান, হৃদরোগের জন্য ব্যবহৃত এমিড্যারন, কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ, স্টেরয়েড ইত্যাদি ওষুধ দীর্ঘদিন খেলে আইএলডি হতে পারে।

আবার প্রদাহবিরোধী ওষুধ মেথোট্রেক্সেট, এজোথায়াপ্রিন ইত্যাদি, নাইট্রোফুরান্টয়ন, সালফোনামাইড, সালফাস্যালাজিন, এমফোটেরিসিন ইত্যাদি এন্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট, ব্রোমোক্রিপটিন, বায়োলজিক্যাল এজেন্ট প্রভৃতি ওষুধের প্রভাবেও এসব রোগ হয়। ক্যান্সার, নানা ধরনের চর্মরোগ, বাতরোগের কারণেও হতে পারে।

উপসর্গ

- প্রায় সব রোগীর ক্ষেত্রে সাধারণ লক্ষণ হলো, শুষ্ক কাশি ও পরিশ্রমের পর শ্বাসকষ্ট হওয়া। সাধারণত কাশির সঙ্গে কফ থাকে না।
- আইএলডিতে সাধারণত বুকে ব্যথা হয় না। তবে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই ইত্যাদি রোগ থাকলে আবার প্রদাহ হয়ে বুকে হালকা বা তীব্র ব্যথা হতে পারে।
- জ্বর, দুর্বলতা, গিরা ব্যথা ও ফোলা, চোখ ও মুখ শুষ্ক, ওজন কমে যাওয়া।
- হাত ও পায়ের নখ মোটা হয়ে বিশেষ আকৃতি ধারণ (ক্লাবিং)।
- ফুসফুসে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে নিশ্বাসের শেষ দিকে এক ধরনের শব্দ পাওয়া যায়, যাকে বলে ক্রেকলস। এই শব্দ অনেকটা জিপার খোলার শব্দের মতো। বুকের এক্স-রে স্বাভাবিক পেলেও অনেক সময় এই ক্রেকলস শুনতে পাওয়া যায়।
- যদিও আইএলডি হলো ফুসফুসের অসুখ। তথাপি তীব্র অবস্থায় অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে পালমোনারি হাইপারটেনশন বা হার্ট ফেইলিওর হতে পারে। পা ফুলে যেতে পারে, পেটে ও যকৃতে ব্যথা হতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

এই রোগের কারণ ও তীব্রতা জানা যায় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। যেমন–

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুকের এক্স-রে করালে দানা ও জালের মতো অস্বচ্ছতা দেখা যায়।
- বুকের হাইরেজল্যুশন সিটি স্ক্যান পরীক্ষাটি বেশ দরকারি। এতে জাল ও দানাদার অস্বচ্ছতা, মৌচাকের মতো বায়ুর থলি, ব্রংকিয়াকটেসিস বা শ্বাসনালির ছিদ্র প্রসারিত হওয়া, ফুসফুসের আকার সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।
- রক্তের আরএ ফ্যাক্টর, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি ইত্যাদি পরীক্ষা।
- স্পাইরোমেট্রির মাধ্যমে ফুসফুসের ভলিউম ও ফুসফুসের গ্যাস দ্রবীভূত হওয়ার ক্যাপাসিটি ও রোগের তীব্রতা বোঝা যায়। চিকিৎসার অগ্রগতিও মনিটর করা যায়।
- ৬ মিনিট হাঁটার একটি পরীক্ষা রয়েছে, যার মাধ্যমে রোগী ওই সময় কতটুকু হাঁটতে পারে, তখন রক্তে অক্সিজেন সম্পৃক্তি কমে যায় কি না এবং রোগের তীব্রতা কেমন–তা বোঝা হয়।
- ইকোকার্ডিওগ্রাফির সাহায্যে পালমোনারি ধমনির রক্তচাপ দেখা হয়। যদি বেশি থাকে, তাকে পালমোনারি হাইপারটেনশন ধরা হয়। এ ধরনের উচ্চ রক্তচাপেরও চিকিৎসা করাতে হয়, যা আইএলডির জটিলতা।
- ব্রংকোস্কপি, থোরাকোস্কপি বা থোরাকোটমি করে ফুসফুসের বায়োপসি করেও আইএলডি নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা দিয়ে ফুসফুসের এই রোগের অবনতি খুব একটা ঠেকানো যায় না। তা ছাড়া ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোগীর কাছে অসহ্য হয়। তবে চিকিৎসকরা এই রোগের সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগীকে এক ও তিন বছর পর পর ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক টিকা দিতে বলেন।

- পালমোনারি রিহেবিলিটেশনে রোগীকে নিয়মিত দৈহিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হয়।
- নির্দিষ্ট কিছু চিকিৎসা যেমন–স্টেরয়েড, অ্যাযোথায়াপ্রিন, সাইক্লোফসক্যাইড, পিরফেনিডন ইত্যাদি বিভিন্ন মেয়াদে দেওয়া হয়।
- অজ্ঞাত কারণে ফুসফুসের ফাইব্রোসিস ঘটে থাকলে তখন ফুসফুস প্রতিস্থাপন করেও রোগীর আয়ুষ্কাল বাড়ানো যায়।

করণীয়

- আইএলডি হওয়ার যেসব কারণ রয়েছে, সেগুলো মেনে চলা। যা নিষেধ তা বর্জন করা।
- মাস্ক ব্যবহার বা সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে ফুসফুসে ধূলিকণা ও জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঠেকানো।
- ধূমপান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা।
- পশুপাখির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা।
- আখ বা ইক্ষুর ছিবড়ায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সলিউশন ব্যবহার করে ছত্রাকের বৃদ্ধি কমানো।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ ব্যবহার না করা ও সতর্ক থাকা।

অনলাইন

কালের কণ্ঠ ২৮ অক্টোবর ২০১৮

‘ইমার্জিং ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন বাংলাদেশের তানজিলে

সমাজে শান্তি ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নয় তরুণের সঙ্গে বাংলাদেশের তানজিল ফেরদৌস পেলেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইমার্জিং ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড’।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ম্যারি রয়েস গত বুধবার ওয়াশিংটনে এক অনুষ্ঠানে উদীয়মান দশ তরুণের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

তানজিলের পাশাপাশি ইরাকের সারা আব্দুল্লাহ আব্দুল রহমান, ইন্দোনেশিয়ার দিওভিও আলফাত, তুরস্কের এস সিফতিসি, লিথুয়ানিয়ার জিনা সালিম হাসান হামু, পাকিস্তানের দানিয়া হাসান, নরওয়ের ন্যান্সি হার্জ, দক্ষিণ আফ্রিকার ইসাসিফিনকসি দিঙ্গি, নামার রোজ রদ্রিগেজ ও তাজিকিস্তানের ফিরুজ ইয়োগবেকভ ২০১৮ সালের ‘ইমার্জিং ইয়াং লিডারস অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত এই দশ তরুণ এখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আছেন। দুই সপ্তাহ ধরে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন।

২৪ বছর বয়সী তানজিল ফেরদৌস কাজ করছেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএএইচসিআরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জাগো ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত।

তানজিলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ব্যুরোর ওয়েবসাইটে বলা হয়, বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধেও সোচ্চার।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এ অর্থনীতিতে লেখাপড়া করা তানজিল বিশ্বাস করেন, তরুণদের সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ ও যুক্ত করা হলে তারা উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবে। কিশোরী ও নারীদের আগামীর নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন তানজিল।

২০১৫ সালে চট্টগ্রামে জাগো ফাউন্ডেশনের ইউথ উইং ভলানটিয়ার্স ফর বাংলাদেশের সভাপতির দায়িত্বে থাকার সময় তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে নিয়ে তানজিল বহু সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

এখন তিনি কাজ করছেন কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে। সেখানে জাগো ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫০০ রোহিঙ্গা শিশুর জন্য নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলতে তিনি সাহায্য করেছেন।

bdnews24.com ০৫ আগস্ট ২০১৮

ক্যান্সার শনাক্ত হবে শুধু রক্ত পরীক্ষায়!

বেশিরভাগ রোগীর ক্যান্সার শনাক্ত হয় রোগের শেষ পর্যায়ে। সেটাও জটিল সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারদের খুব একটা কিছু করার থাকে না। বিশ্বে এখন পর্যন্ত এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি, যার মাধ্যমে আগে থেকেই ক্যান্সার শনাক্ত করা যায়। তবে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন বাংলাদেশের এক দল গবেষক। তাঁদের গবেষণায় শুধু রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই ক্যান্সারের ভবিষ্যদ্বাণী করার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এরই মধ্যে এ গবেষণার ফলের পেটেন্টের জন্য একযোগে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে আবেদন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) আওতায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকের নেতৃত্বে এক দল গবেষক নন-লিনিয়ার অপটিকস গবেষণায় ক্যান্সার শনাক্তকরণের সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন।

গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই গবেষণা মূলত ক্যান্সার নির্ণয়ের সহজ একটা পদ্ধতি। আমরা হেকেপের সহায়তায় এই ভিন্নধর্মী গবেষণা করেছি। হেকেপের দেশি-বিদেশি স্পেশালিস্টরা এ গবেষণা দেখার পরই তা ইউএসএ পেটেন্টের জন্য আবেদনের আগে কাউকে না জানানোর জন্য বলেন। কারণ এ ধরনের গবেষণা বিশ্বে প্রথম। নিশ্চয়ই এ গবেষণার গুরুত্ব আছে বলেই তাঁরা পেটেন্টের জন্য আবেদন করতে বলেছেন। তবে এ বিষয়ে আরো অনেক উচ্চতর গবেষণা প্রয়োজন।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ পদ্ধতিতে একজন রোগীর দেহে কোনো ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবেশ না করিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে নতুন একটি পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করে সম্ভাব্য ক্যান্সারের ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'Method and system based on non-linear optical characteristics of bodz fluids for diagnosis of neoplasia' শীর্ষক একটি পেটেন্টের আবেদন একযোগে বাংলাদেশ ও ইউএসএ পেটেন্ট অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে গত ৯ জুলাই। এই নতুন পদ্ধতি আগে কখনোই কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই আশা করা যায়, ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি হিসেবে এটি সম্ভাবনার নতুন একটি দ্বার উন্মোচন করেছে।

সূত্র জানায়, এ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত রোগীদের রক্তে এমন কিছু একটা অনুসন্ধান করে বের করা সম্ভব হবে, যার নন-লিনিয়ার ধর্মটি ক্যান্সার রোগের সম্ভাব্যতার একটি ধারণা দেবে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে শুধু ক্যান্সার

অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক

রোগাক্রান্ত রোগীদের রক্ত নয়, অন্য যেকোনো স্যাম্পলের নন-লিনিয়ার ধর্ম খুবই সহজে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

জানতে চাইলে ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যান্সার ইপিডেমিওলজি বিভাগের প্রধান ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখন পার্টিকুলার ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সেখানে বায়োপসির মতো পরীক্ষারও প্রয়োজন পড়ে। আর সাধারণত যখন কারো সন্দেহ হয় বা রোগের উপসর্গ দেখা দেয় তখনই মূলত রোগীরা আসে। এখন যদি নতুন কিছু আবিষ্কৃত হয়, তাহলে সেটা তো খুবই ভালো। আর এই আবিষ্কার বাংলাদেশের গবেষকরা করলে চিকিৎসাক্ষেত্রে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাব।'

জানা যায়, ২০১৬ সালের মার্চ মাসে 'নন-লিনিয়ার অপটিকস ব্যবহার করে বায়োমার্কার নির্ণয়' শীর্ষক প্রকল্পটি হেকেপের আওতায় সিপি-৪০৪৪ হিসেবে গৃহীত হয়। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে নন-লিনিয়ার বায়ো-অপটিকস রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে একটি নতুন ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হয়। এ ল্যাবরেটরিতে ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের রক্তের সিরামে শক্তিশালী লেজার রশ্মি পাঠিয়ে নন-লিনিয়ার ধর্মের সূচক পরিমাপ করার কাজ শুরু হয়েছে। ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ে বায়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় যে বাড়তি রি-এজেন্ট ব্যবহার করতে হয়, শাবিপ্রবিতে উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতিতে তার কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

২০১৫ সালের দিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) এই নন-লিনিয়ার অপটিকস রিসার্চ গ্রুপটি গবেষণার ব্যাবহারিক দিক নিয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রুপটি হেকেপের উইন্ডো ফোরের আওতায় ইউনিভার্সিটি-ইন্ডাস্ট্রি সমন্বিত গবেষণার জন্য একটি উদ্ভাবনীমূলক পরিকল্পনা জমা দেয়। পরিকল্পনাটি ছিল ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের নন-লিনিয়ার ধর্ম পরিমাপ করে ক্যান্সারের সম্ভাব্য উপস্থিতি ও অবস্থা চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন। অর্থাৎ প্রচলিত বায়োকেমিক্যাল ক্যান্সার নির্দেশক বায়োমার্কারের পরিবর্তে একটি অপটিক্যাল বায়োমার্কার উদ্ভাবন করা।

■ শরীফুল আলম সুমন
কালের কণ্ঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

উপদেশ-কূপদেশ

শওকত ওসমান

সচরাচর কথাবার্তায় বাংলাভাষীরা বলে থাকে বাড়ি-টাড়ি, আপিস-টাপিস, ছুটি-ফুটি, খাবার-টাবার–এই মানে বোঝা গেলে। টুধের–এই জাতীয় জোড়-শব্দের ঠেলায় কাৎ। দুধ-টুধ। দুধের মানে বোঝা গেল। টুধের অর্থ কী? লজিক ধরে মানুষ কথা বলে না। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাংলাভাষায় থেকে গেছে। বাংলাভাষী মাত্রই এখানে লজিক মানে না, মানতে রাজী নয়। কারণ, তার ভাব-প্রকাশে যদি লজিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অমন জঞ্জাল জীইয়ে রাখার প্রয়োজন কোথায়?

ভাষা-বিজ্ঞানীরা অবিশ্যি বাংলাভাষার ওই রকমসকমের হদিস ধরে ফেলেছেন। দ্রাবিড় ভাষায় নাকি অমন খসলৎ আছে। তারি প্রভাব ঢুকে গেছে বাংলাভাষায়। পণ্ডিত-টণ্ডিতদের এসব গবেষণা নিয়ে আলোচনা এখানে বাহুল্য। কারণ, এই নিবন্ধের গন্তব্য অন্যত্র। পাঠক-মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন, শিরোনামে লেখা উপদেশ-কূপদেশ। অনেকে ভাবতে পারেন, দ্রাবিড় ভাষায় প্রবাহ বোধ হয় ওখানে রয়ে গেছে।

না, আদৌ না। কূপদেশ শব্দ অর্থহীন নয়। কূপ মানে কুয়া। দেশ এলাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, কুয়ার এলাকা। এই এলাকায় পড়ে গেলে অনেক দুর্গতি। তা আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। এমন কত খবর না সংবাদপত্রে প্রায় পড়া যায়। একজন কুয়ায় পড়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আর একজনের প্রাণ গেল। ভেতরে গ্যাস ছিল। তার জন্যে অমন দুর্ঘটনা।

এই নিবন্ধের শিরোনাম তেমনই অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ উপদেশ এক ধরনের কূপ হতে পারে এবং তার গর্তে পড়ে গেলে জান খতম। আরো ব্যাপক অর্থে, উপদেশ নানা বিপদের উৎস হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

এইখানে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

উপদেশ ছাড়া একটা জাতির জীবন গড়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তির জীবনেও তা অপরিহার্য। গুরুজনদের উপদেশ ছাড়া দেশের তরুণ সমাজ কী ভাবে গড়ে উঠবে? ভবিষ্যতে তারাই তো সমাজের পরিচালক হয়ে আসে বিভিন্ন রূপে। দেশের শিক্ষক, প্রশাসক-প্রকৌশলী, কারিগর এবং জাতীয় জীবন-ধারার প্রতি ক্ষেত্রে এক কালের কিশোর-তরুণেরাই তো পারে সর্বেসর্বা: তারাই ধরে জাতির অগ্রগতির হাল উত্তরকালে।

শিক্ষকদের কাছ থেকে শুধু লেকচার নয়, উপদেশের কথাও শোনা যায়। ছাত্র যদি শেখার জন্যে নবিশী সময় প্রয়োজন। শিক্ষার এই কাল শুধু কলকব্জা যন্ত্রপাতির হদিস নয়, বরং উপদেশের বীজ-রোপণের কাল। যা-কে আমরা নৈতিকতা বলি, তা সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার পথ দেখিয়ে দেয় উপদেশ।

মানুষের ছ' হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। যুগযুগান্তের জ্ঞান ইলেম হিকমৎ-হুনর আসলে কী উপদেশ নয়? পূর্বপূরুষেরা কি ভাবতেন কি করতেন, সেই জ্ঞানও আমাদের পথ-চলার হদিস জানায়। যা পথচলার হদিস দেয় তার মূল তাৎপর্য হচ্ছে উপদেশ।

অথচ নিবন্ধের শিরোনামে বেশ একটি শ্লেষ-মাখা কটাক্ষ আছে। অর্থাৎ, উপদেশ-কূপদেশ হতে পারে। সেটুকুই এখন ভেবে দেখা দরকার। কেন অমন হেডিং?

উপদেশ কী কূপদেশ হতে পারে?

পূর্বকালে মানুষের উপদেশের উৎস ছিল সমাজ এবং পরিবার। প্রচারের নানা রকম মাধ্যম তো ছিল না। তাই উপদেশ-দানের গুরু হতেন পিতামাতা এবং যে-পরিমণ্ডলে বাস–যথা পাড়া, মহল্লা, গ্রাম ইত্যাদি। আধুনিক যুগে জীবন-ধারা বেশ জটিল হয়ে গেছে। তাই উপদেশের উৎস খুব সহজলভ্য নয়। পূর্বে গ্রামজীবনে ব্যক্তির উপরে সমাজের দাপট ছিল বেশি। শহর সেদিক থেকে অনেক শিথিল। পাড়ায় একটা মানুষ সাধু থাকতে পারে। কিন্তু শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় সে হয়ত অন্য পাড়ায় দুষ্কর্মের পাণ্ডা।

বর্তমান যুগে এসব অসুবিধা আছে। পূর্বে গ্রামে কোন সমস্যার সমাধানে প্রতিবেশী ও অন্য লোক ছিল। বর্তমান শহরে তেমন অর্থে প্রতিবেশী থাকে না। সেখানে বিভিন্ন স্তর আছে। গুলশান, বনানী এলাকায় পাশাপাশি বাড়ি আছে। কিন্তু এক বাড়ির লোক অন্য বাড়ির প্রতিবেশী নয়। গ্রামের সেই আটসাঁট সম্পর্ক পাওয়া দায়। গ্রামে মৌলবী সাহেব আছেন। কোনো ধর্মীয় বিধানে তিনি সাহায্য করতে পারেন। তার বাড়ি নির্দিষ্ট, পেশাও নির্দিষ্ট। বিস্তীর্ণ শহরে ধারে কাছে তেমন মেলা দুষ্কর। সুতরাং কোনো উপদেশ প্রয়োজন হলে তা সহজলভ্য নয়।

এই যুগে এসব সমস্যা বা বিপদ আছে। তাই অনেক সময় উপদেশ কূপদেশ বনে যেতে পারে।

অতীতের বহু প্রবাদ উপদেশের মোড়কে অবতীর্ণ হয়। আজও। কারণ, লোকে পায় সেখানে নিজের কর্তব্য বা করণীয় কাজের হদিস। তা থেকে একটা উপদেশ তথা প্রবাদ বেছে নিয়ে দেখা যাক তার গতি-প্রকৃতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। [চলবে...]

কীভাবে বুঝব আমার প্যাশন কোনটা?

গুরুজনেরা বলেন–'Follow your passion and success will follow you.'

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিজের প্যাশন খুঁজে বের করা খুব জরুরি। পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের প্রায় সবাই নিজ নিজ প্যাশনকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু প্যাশন আসলে?

আমাদের অনেকের গান গাইতে ভালো লাগে, কারো ভালো লাগে গল্প লিখতে। কারো ফটোগ্রাফি স্কিল সত্যিই অবাক করার মতো! যদি তোমার সবচেয়ে পছন্দের একটি কাজ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তুমি কী উত্তর দিবে?

যে কাজটি তোমার কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে, জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয় সেটিই হলো প্যাশন। তোমার প্যাশন খুঁজে পেতে আজ থেকেই কিছু নিয়ম মেনে চলা শুরু করে দাও।

দারুণ সব লেখা পড়তে ও নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে ঘুরে এসো আমাদের ব্লগের নতুন পেইজ থেকে!

১. নিজেকে জানো :

'Know thyself'

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের এই উক্তিটি আমরা সবাই শুনেছি। নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে তুমি তোমার ভালো লাগার বিষয়টি খুঁজে পাবে। মেডিটেশন এক্ষেত্রে তোমাকে সহায়তা করতে পারে। প্রতিদিন অল্প কিছু সময় নিজের জন্য রাখো।

২. পছন্দের বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করো:

ছোটবেলায় তুমি হয়তো খুব ভালো ছবি আঁকতে। অথবা স্কুল-কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেক পুরস্কার জিতেছো তুমি। দিনশেষে নিজেকে প্রশ্ন কর, সারাদিনে কোন কাজগুলো করতে গিয়ে তুমি একদম বিরক্ত হও নি। কোন কাজটি না করলে দিনটাই বৃথা মনে হয়।

ঘুরে আসুন: যদি চাও perfection ছুঁড়ে ফেলো distraction

যে কাজগুলো করে তুমি সত্যিই আনন্দ পাও নিজের পছন্দের বিষয়ের তালিকায় সেগুলো লিখে ফেলো।

সুন্দরভাবে কথা বলা সাফল্যের অন্যতম রহস্য!

মানুষের সাথে সুন্দর ও মার্জিতভাবে কথা বললে যেকোনো কাজ কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়!

৩. নতুন সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাও:

প্রতিদিন কত কত সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য! অনেকদিন ধরে একই কাজ না করে বরং নতুন সুযোগকে কাজে লাগাও। এতে যেমন একঘেয়েমি দূর হবে তেমনি তুমি নিজেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত করতে পারবে।

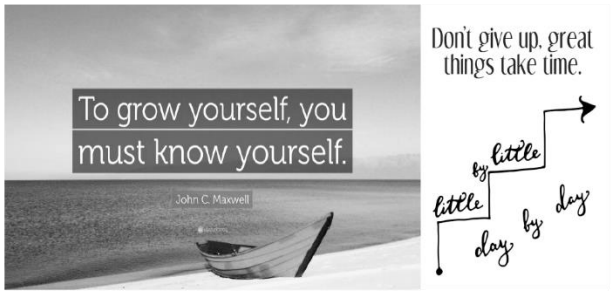

কোনো একটি কাজ করতে করতে হয়তো একদিন তুমি তোমার প্যাশনকে খুঁজে পাবে। কে জানে? হয়তো নতুন কোনো কাজে পারদর্শী হয়েও উঠতে পারো তুমি!

৪.পরামর্শ নাও:

নিজের প্যাশন খুঁজে পেতে পরিবার, বন্ধু, শিক্ষকদের পরামর্শ তোমাকে অনেকাংশেই সহায়তা করবে। তোমার রোল মডেল বা প্রিয় ব্যক্তিত্ব, যার আদর্শ তোমার অনুকরণীয় বলে মনে হয় তাঁর উপদেশ মেনে চলো।

৫. হাল ছেড়ে দিও না:

২০০৪ সালে ফোর্বস প্রথম বিলিয়নিয়ার লেখক হিসাবে ফ্যান্টাসি সিরিজ হ্যারি পটারের লেখিকা জে কে রাউলিং-এর নাম প্রকাশ করে। হ্যারি পটার সিরিজের ১ম গল্পটি লেখা শেষ করার পর বইটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশকদের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয় রাউলিংকে। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি।

Your true passion is not found overnight, but is realised through series of discoveries of small interests

আটজন প্রকাশক ফিরিয়ে দেয়ার পর ব্লুমসবারি নামের একটি প্রকাশনী ১৯৯৭ সালের ২৬ জুন হ্যারি পটার সিরিজের প্রথম বই 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন' প্রকাশ করে। এরপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। একেবারে অচেনা-অজানা জে কে রাউলিং হয়ে যান বিশ্ববিখ্যাত।

সঠিকভাবে কোনো ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করতে পারা ইংরেজিতে ভালো করার জন্য অত্যন্ত জরুরি। শিখে নাও উচ্চারণ!!

তোমার প্যাশন খুঁজে পেতে তুমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারো। তবে হাল ছেড়ে দিও না। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। নিজের ছোট ছোট ভালো লাগার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দাও।

৬. হতাশ হলে চলবে না:

আমাদের অনেকের একটি প্রধান সমস্যা হল 'কোনো কিছুই ভালো লাগে না'। যা-ই করি না কেন, কিছুতেই মন বসে না। অলসতার কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাবে নতুন কোনো কাজেও নিজেদের যুক্ত করি না। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

হতাশ না হয়ে তোমার সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাও। আর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। ধৈর্য আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তুমি তোমার প্যাশন খুঁজে পেতে পারো।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮10minuteschool.com

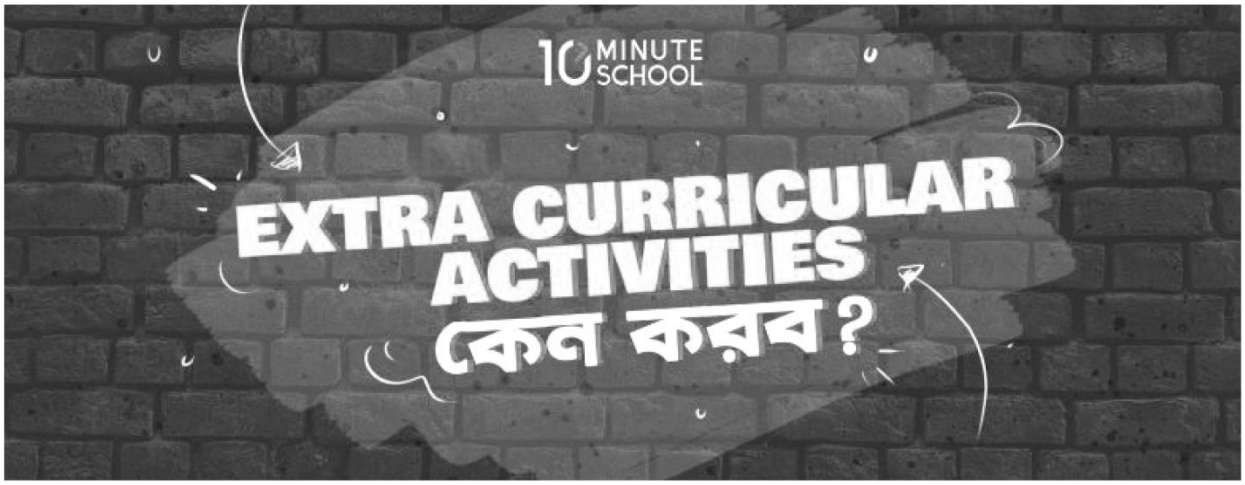

এখন আর ঘরের বাইরে ছেলেমেয়েদের খেলতে দেখা যায় না। সারাদিন তাদের দেখা যায় বইয়ের পাতায় নিমগ্ন কিংবা ইন্টারনেটের দুনিয়ায় হারিয়ে থাকতে। একটা প্রবাদ আছে না? 'গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নাহি বিদ্যা নাহি ধন হলে প্রয়োজন'। তাই বিদ্যা যেন বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের জীবনেও কাজে লাগে সেজন্য অংশগ্রহণ করতে হবে এক্সট্রা কারিকুলার কর্মকাণ্ডে।

এখনকার ছেলেমেয়েদের মাঝে যে জিনিস লক্ষ করা যায় সেটি হচ্ছে তারা পড়াশোনায় যদিও খুব বেশি অংশগ্রহণ করে কিন্তু খেলাধুলা কিংবা অন্যান্য Extra Curricular Activities এ সেই তুলনায় তাদের অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য। এটা যে সবসময় তারা স্বেচ্ছায় করছে তা কিন্তু নয়। এজন্য তাদেরকে চাপ দেয়া হয় অভিভাবক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে। রেজাল্ট ভালো করলে বৃত্তি পাওয়ার লোভে ছেলেমেয়েরা সারাদিন পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে থাকে।

আমি পড়াশোনা না করতে বলছি না। অবশ্যই পড়াশোনা করা উচিত। কিন্তু শুধু পড়াশোনাই জীবনের একমাত্র কাজ হতে পারে না। এর সাথে আনুষঙ্গিক আরো নানা কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এত এত পড়াশোনার চাপ সামলিয়ে পড়াশোনার বাইরে আর তেমন কিছু যেন করাই হয়ে ওঠে না। ফলে দিন শেষে ছেলেমেয়েরা অর্জন করছে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা। প্রতিকূল কর্ম জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য আনুষঙ্গিক যেসব দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলোর বেশ অভাব লক্ষ্য করা যায় এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আবার তার উপর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে এমন একটা প্রভাব ফেলেছে যেন পড়াশোনার অর্জনের কাছে অন্যান্য সকল অর্জন সবসময় হেরে যায়। এখন অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েরা বিতর্ক প্রতিযোগিতা কিংবা বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করলে খুব একটা খুশি হয় না। কিন্তু সেই একই ছেলেমেয়ে যখন পড়াশোনায় প্রথম স্থান অধিকার করে তখন পুরো পরিবার এবং সমাজের বাহবা কুড়ায়।

কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। দুটি অর্জনই তো সমান বাহবার যোগ্য। এদের মাঝে তো একটা সামঞ্জস্য থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যতা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। এর জন্য দায়ী পরিবার, সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমরা নিজেরাই।

এখন আর ঘরের বাইরে ছেলেমেয়েদের খেলতে দেখা যায় না। সারাদিন তাদের দেখা যায় বইয়ের পাতায় নিমগ্ন কিংবা ইন্টারনেটের দুনিয়ায় হারিয়ে থাকতে। একটা প্রবাদ আছে না? 'গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নাহি বিদ্যা নাহি ধন হলে প্রয়োজন'। তাই বিদ্যা যেন বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের জীবনেও কাজে লাগে সেজন্য অংশগ্রহণ করতে হবে এক্সট্রা কারিকুলার কর্মকাণ্ডে। চলুন এক নজরে দেখে নিই কেন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ আমাদের জীবনে এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

১. সিভি ভারী করে

আমরা হয়তো বা অনেকেই জানি না যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশগুলোতে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন সব ছাত্র-ছাত্রীকে অগ্রাধিকার দেয় যাদের রেজিউমে একাডেমিক পড়াশোনা সহ এক্সট্রা কারিকুলার অন্যান্য এক্টিভিটিস দ্বারা পরিপূর্ণ।

চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক এরকমই। পড়াশোনায় ভালো হলেই যে ভালো চাকরি পাবে এমনটি নয়। অনেক সময় ক্লাসের পেছনের সারির ছেলেমেয়েরা প্রথম সারির ছেলেমেয়েদের থেকে ভালো চাকরি পায়। এর মূল কারণ হচ্ছে মাঝারি ধরনের কিংবা পেছনের সারির ছাত্র-ছাত্রীরা Extra curricular activities এ

বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য যে দক্ষতা তা শুধুমাত্র একাডেমিক পড়াশোনায় ভালো ছাত্র-ছাত্রী থেকে অনেক গুনে ভালো হয়ে থাকে।

তাই যারা বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে আগ্রহী কিংবা কর্পোরেট সেক্টরে চাকরি করতে আগ্রহী, তাদের উচিত পড়াশোনার পাশাপাশি Extra CCurricular Activities এ মনোনিবেশ করা।

২. কর্মদক্ষতা বাড়ায়

ছোটবেলা থেকেই যারা খেলাধুলা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে, তারা সাধারণত অন্যান্য সাধারণ ছেলেমেয়ে থেকে শারীরিকভাবে কর্মঠ হয়ে থাকে। কায়িক পরিশ্রমের ফলে বিপাক প্রক্রিয়া এবং রক্ত প্রবাহ বাড়ে। এতে আরো বাড়ে স্টামিনা এবং মানসিক সতর্কতা। এগুলো এবং সাথে শক্তি বাড়ার ফলে দূর হয় অবসন্নতা। ফলে স্বাভাবিক জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত মানুষগুলো অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভাল করে থাকে। তাদের একটানা অনেকক্ষণ কাজ করতেও খুব একটা সমস্যা হয় না। কঠোর পরিশ্রম করতে পারার কোন থাকার কারণে তারা সকল ক্ষেত্রেই অন্যদের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে। ফলে সাফল্য ধরা দেয় অতি দ্রুত।

দারুণ সব লেখা পড়তে ও নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে ঘুরে এসো আমাদের ব্লগের নতুন পেইজ থেকে!

৩. দলবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখায়

ছোটবেলা থেকেই Extra Curricular Activities এ বিভিন্ন দলে থেকে কাজ শেখার ফলে দলগতভাবে কাজ করার একটি মূল্যবান গুণ ছেলেমেয়েদের মাঝে সৃষ্টি হয়। সাধারণত যেসব ছেলেমেয়ে ছোটবেলা থেকে শুধু পড়াশোনাতেই মগ্ন থাকে, তারা দলবদ্ধভাবে কোন কাজ করে অভ্যস্ত নয়। এর ফলে যখন তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন টিমওয়ার্ক করতে গেলে তারা দিশেহারা হয়ে যায়।

দলবদ্ধভাবে কাজে কিছু জিনিস শিখতে পারা যায় যেগুলো বইয়ের পাতা থেকে শেখা যায় না। সেগুলো হলো বিবাদ মিটাতে পাড়ার গুণ, মানুষকে প্রভাবিত করতে পারার গুণ, নেতৃত্ব দিতে পারার গুণ ইত্যাদি। এই গুণগুলো শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হয়। এবং ছোটবেলা থেকে এই অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দেয় এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ। ছোটবেলা থেকেই Extra Curricular Activities ছেলেমেয়েদের সামনে উন্মুক্ত করে দিলে তারা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সক্ষম এবং শক্তিশালী। আপাতদৃষ্টিতে এর খুব একটা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে না পারা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে এর প্রভাব খুব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

৪. সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তোলে

আগ্রহ, ব্যতিক্রমী চিন্তা ধারা এবং সৃজনশীলতা মানুষের মাঝে নিজ থেকেই জন্ম নিতে পারে। কিন্তু তাই বলে যে এগুলো গড়ে তোলা যায় না তা কিন্তু নয়। সঠিক পরিবেশ প্রদান করতে পারলে যে কারো মাঝেই এই গুণ গুলো গড়ে ওঠে। কিন্তু এই গুণগুলো রাতারাতি কারো মাঝে গড়ে তোলা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা এবং সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এগুলো নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

চিত্রাংকন, গান কিংবা লেখালেখি এগুলো সবই সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যখন শিশু-কিশোররা এ ধরনের কর্মকাণ্ডগুলোতে অংশগ্রহণ করে তখন তাদের সামনে নতুন একটি দ্বার উন্মোচিত

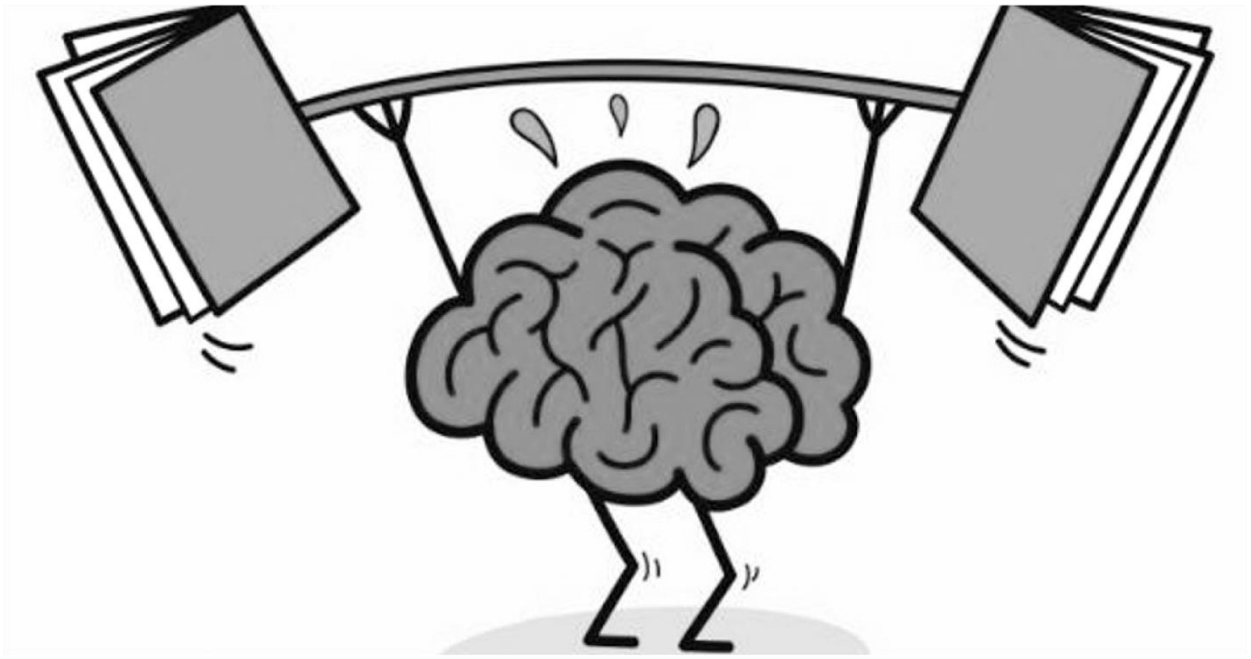

হয়। এই দ্বার তাদের সৃজনশীলতার পথ দেখায়। ফলে বদলে যায় তাদের চিন্তা ধারা। তাদের কর্মকাণ্ডে লক্ষ্য করা যায় নতুনত্ব এবং ব্যতিক্রম একটি ধারা। সৃষ্টিশীলতার বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই। এটি ফুটে উঠতে পারে আঁকা আঁকি, গান গাওয়া, বিতর্ক করা, লেখালেখি করা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাঝে। তাই যার যেই কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বেশি তার সেদিকেই মনোনিবেশ করা উচিত।

৫. সুন্দর সামাজিক জীবন নিশ্চিত করে

খেয়াল করে দেখবেন যারা বইয়ের পোকা, অর্থাৎ শুধু বই নিয়েই সারাদিন পড়ে থাকে, তাদের বন্ধু-বান্ধব খুব একটা বেশি হয় না। এর কারণ হলো তারা খুব একটা বাইরে যায় না এবং মানুষের সাথে মিশে না। আপনি যখন বাইরে যাবেন, বাস্তব জগতের সাথে পরিচিত হবেন, নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন, তখনই আপনার নতুন বন্ধু-বান্ধব হবে। নতুন নতুন মানুষের সাথে মিশতে গেলে যখন দেখবেন তাদের সাথে আপনার পছন্দগুলো মিলে যাচ্ছে তখন তাদের সাথে আপনার বন্ধন সুদৃঢ় হবে। গ্রুপ এক্টিভিটিস গুলো এই পদ্ধতিগুলোকে আরও সহজ করে।

যখন আপনি গ্রুপের সাথে কোন কাজ করবে, হোক সেটা খেলাধুলা বা অন্য কিছু, তখন তাদের সাথে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষিত হবে। ফলে আপনাদের মাঝে দৃঢ় একটি বন্ধনের সৃষ্টি হবে। এ বন্ধনগুলোই আপনার সামাজিক জীবনকে করে তুলবে সুন্দর।

লিডারশীপ এর ব্যাপারে সব তথ্য জেনে নাও এখান থেকে!

কর্পোরেট জগতে চাকরির ক্ষেত্রে কিছু জিনিস ঠিক ঠাক রাখা অত্যন্ত জরুরি।

৬. মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে

শুধুমাত্র যে কর্মজীবীরা মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন তা কিন্তু নয়। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরাও মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে একটার পর একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পরীক্ষা ইত্যাদি। এত কিছুর চাপে শিক্ষার্থীরা নুয়ে পড়ে। চাপ কমানোর চমৎকার কিছু সুযোগ করে দেয় Extra Curricular Activities গুলো। এই কর্মকাণ্ডগুলো সুযোগ করে দেয় অতি প্রয়োজনীয় বিরতি এবং চিত্ত-বিনোদনের। এগুলো মস্তিষ্ককে ঠান্ডা করে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়। ফলে মনোযোগ বাড়ে কাজ কর্মে।

৭. সুন্দর সময় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে

যখন আপনি আগে থেকেই একাধিক কাজ একসাথে করে অভ্যস্ত থাকবেন, তখন যেকোন কাজে আপনার সময় ব্যবস্থাপনা এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজকে ভাগ করা অন্যের চেয়ে অধিক সুন্দর হবে। কর্ম জীবনে এমন অনেক অবস্থার সম্মুখিন হবেন যেখানে আপনাকে একসাথে অনেকগুলো কাজ করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার পূর্বের অভিজ্ঞতা অনেকাংশে আপনার কাজ সহজ করে দেবে।

আবার গুরুত্বের ভিত্তিতে আপনি যখন কাজ ভাগ করতে শিখবেন তখন দেখবেন সীমাবদ্ধ সময় এর মাঝে অনেকগুলো কাজ করতে হলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। বিভিন্ন Extra Curricular Activities গুলোতে অংশগ্রহণ করলে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করা যেমন শিখবেন তেমনি শিখবেন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে।

খুব সহজেই মার্কেটিং শিখে নাও আমাদের এই মার্কেটিং প্লে-লিস্টটি থেকে!

৮. আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

নিজের প্রতি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না থাকলে আপনি মাঝে মাঝেই হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন। যেসব শিশুকিশোররা গতানুগতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া জীবনে নতুন কিছু চেষ্টা করেনি তারাও এই সমস্যাটির সম্মুখিন হয়। বলা হয়ে থাকে 'শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। তাই যদি আপনি বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে আপনার মাথায় নেতিবাচক চিন্তাগুলো আসার সময় পাবে না।

যখন একাধিক কাজ করবেন তখন আপনার কাছে নিজেকে মূল্যবান মনে হবে এবং বাড়বে আপনার আত্মবিশ্বাস। এতে করে আপনি হয়ে উঠবেন জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ। ফলে আপনি হবেন আগের থেকে আরও বেশি শক্তপোক্ত এবং সকল ধরনের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন।

৯. সর্বোপরি উন্নতি ঘটায়

যেসব মানুষ একাধিক জিনিস করতে পারে তাদের মূল্য যারা একটি জিনিস অভিজ্ঞ তাদের থেকে অনেক বেশি। Extra Curricular Activities তে অংশগ্রহণ করলে শিশুকিশোররা নানা ধরনের দক্ষতা অর্জন করে। এতে করে তাদের সর্বোপরি উন্নতি ঘটে। ফলে কর্মজীবনে প্রবেশ করার সময় এরা অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

১০. প্রতিভার বিকাশ নিশ্চিত করে

সবার মাঝেই কোনো না কোনো একটি বিশেষ প্রতিভা লুকানো থাকে। এই প্রতিভাকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে না তুললে এটি আজীবনই নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। শিশুকিশোরদের নানারকম Extra Curricular Activities তে নিয়োজিত করলে তারা তাদের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পায়। তারা তাদের শক্তি, দুর্বলতা এবং আগ্রহ খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারে।

তারা তাদের নিজের একটি নতুন রূপ উন্মোচিত করার সুযোগ পায় যা সম্পর্কে তারা পূর্বে অবগত ছিল না। এতে করে তাদের সামনে উন্মুক্ত হয় নতুন নতুন ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা। যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা আসলে কত কিছু অর্জন করতে সক্ষম তখন ঘুরে যায় তাদের জীবনের মোড়। তৈরি হয় সফলতার এক একটি গল্প।

আশাকরি উল্লিখিত কারণগুলো Extra Curricular Activities এর গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট। তাই নিজে যেমন এ কর্মকাণ্ডগুলোতে অংশগ্রহণ করা উচিত তেমনি অপরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত। এতে করে সৃষ্টি হবে একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী যারা এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে উন্নতির পথে।

সূত্র : 10minuteschool.com

বিসিএস প্রস্তুতি

লিখিত পরীক্ষার ট্রাম্পকার্ড গণিত

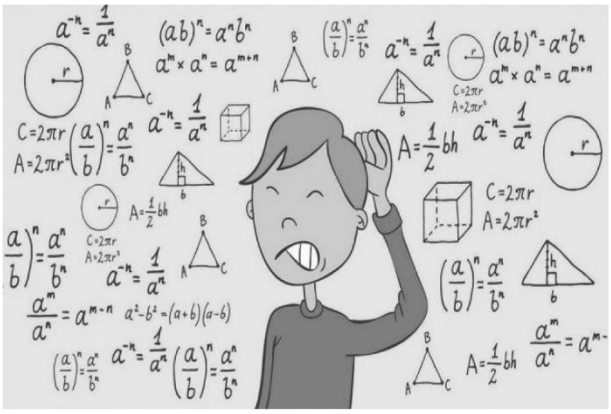

গণিত হলো বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ট্রাম্প কার্ড। এ বিষয়ে আপনি অন্য পরীক্ষার্থী থেকে যতটা এগিয়ে থাকতে পারবেন, অন্য বিষয় দিয়ে সেটা প্রায় অসম্ভব। গণিতে ভালো করা মানে প্রত্যাশিত ক্যাডার পাওয়ার দৌড়ে অনেক এগিয়ে থাকা। একটুখানি সচেতন হলেই গণিতে ভালো নম্বর তোলা সম্ভব। গণিত অনুশীলনের বিষয়। যিনি যত অনুশীলন করবেন, তিনি পরীক্ষায় তত ভালো করবেন। ট্রাম্প করুন (গণিতে ভালো করুন), অন্যদের চেয়ে বেশি নম্বর পান এবং ক্যাডার হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকুন। সহজ হিসাব।

- **নম্বর বণ্টন :** সাধারণ ও টেকনিক্যাল–উভয় ক্যাডারে গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতায় মোট বরাদ্দ ১০০ নম্বর। ৫০ নম্বরের গাণিতিক যুক্তি ও ৫০ নম্বরের মানসিক দক্ষতা। গাণিতিক যুক্তি অংশে ৫ নম্বরের ১২টি প্রশ্ন থাকে, যেকোনো ১০টির উত্তর করতে হয়। মানসিক দক্ষতা অংশে ৫০টি এমসিকিউ থাকে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মতো প্রতিটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ, ভুল হলে কাটা যাবে ০.৫ নম্বর।
- **ক্যালকুলেটর :** গাণিতিক যুক্তি অংশে সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। তবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। মানসিক দক্ষতা অংশে ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- **দুই অংশ মিলিয়ে যোগফল ৩০ :** অনেক প্রার্থীর মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতায় আলাদাভাবে ৩০ পেলে তা মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে। এর কম পেলে যোগ হবে না। এটা ভুল ধারণা। দুই অংশের যোগফল ৩০ হলেই তা মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে।

গাণিতিক যুক্তি

গাণিতিক যুক্তির মোট ১২টি টপিক রয়েছে। সাধারণত প্রতিটি টপিক থেকেই প্রশ্ন করা হয়। সরলীকরণ, পাটিগণিত (ঐকিক নিয়ম, গড়, শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, লসাগু, গসাগু, অনুপাত, সমানুপাত, লাভক্ষতি), বীজগাণিতিক সূত্র, বহুপদীর উৎপাদক, একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ ও অসমতা, দুই বা তিন চলকবিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ পদ্ধতি, সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা ও অনুক্রম, রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, বৃত্ত, পিথাগোরাস, ক্ষেত্রফলসংক্রান্ত উপপাদ্য ও অনুসিদ্ধান্ত, পরিমিতি, স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, সরলরেখার সমীকরণ, ত্রিকোণোমিতির দূরত্ব ও উচ্চতা, সেট ও ভেনচিত্র, বিন্যাস, সমাবেশ, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি টপিকের ওপর প্রশ্ন করা হয়।

প্রস্তুতি ও লেখার কৌশল

- প্রথমে বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার গাণিতিক যুক্তির প্রশ্নগুলো দেখে নেবেন। বিশেষ করে ৩৪তম বিসিএস পরবর্তী লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন। এতে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা হবে। লিখিত পরীক্ষার গাণিতিক যুক্তি অংশের বেশিরভাগ টপিক মাধ্যমিক গণিত ও উচ্চতর গণিত অংশের সঙ্গে মিলে যায়। এ ছাড়া কিছু বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক বীজগণিত বই থেকে করতে হয়। মাধ্যমিক গণিত বইয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ অধ্যায়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক উচ্চতর গণিত বইয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ অধ্যায়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ মাধ্যমিক বীজগণিত ও ত্রিকোণোমিতি বই থেকে বিন্যাস সমাবেশ, সম্ভাব্যতা, সেট, ভেনচিত্র ও ত্রিকোণোমিতি বিষয়গুলো করতে পারেন। এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক জ্যামিতি ও ক্যালকুলাস বই থেকে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি ও সরলরেখার সমীকরণ অধ্যায় করতে পারেন।
- যে অধ্যায়ের গণিত অনুশীলন করবেন, তার প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো প্রথমেই একটি খাতায় লিখে রাখুন। এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের সূত্রগুলো লিখে ফেলুন। পরীক্ষার আগে রিভাইস করতে সুবিধা হবে।
- গণিত অনুশীলন দুভাবে করা যায়। চোখ দিয়ে দেখে এবং হাতে-কলমে অনুশীলন করে। পরীক্ষায় যেহেতু আপনাকে হাতে-কলমে গণিত করতে হবে, তাই হাতে-কলমে গণিত অনুশীলন করার অভ্যাস করুন। চোখ দিয়ে দেখে অনুশীলন করলে পরীক্ষায় গণিত করতে গিয়ে মাঝপথে আটকে যাবেন।
- বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী সাধারণত জ্যামিতি উত্তর করবে না–এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জ্যামিতি অংশ বাদ দিয়ে প্রস্তুতি নেয়। এই অংশ বাদ দেবেন না। প্রশ্নকর্তা সাধারণত দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন এমনভাবে করেন, যা পরীক্ষার হলে উত্তর করে আসা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে জ্যামিতি বিপদের বন্ধুরূপে পাশে থাকে। বিগত লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো অনুশীলন

করলে জ্যামিতি কমন আসতে পারে।

- প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মতো শর্টকাটে অঙ্ক করবেন না। লিখিত পরীক্ষায় সব অংশ ভেঙে করুন। প্রয়োজনীয় সাইড নোট দিন। এতে যিনি খাতা দেখবেন, তিনি নম্বর কাটার সুযোগ পাবেন না। গণিত করা শেষ হলে উত্তর লিখবেন। উত্তর না লিখলে নম্বর কাটা যাবে।
- পরীক্ষায় কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে আটকে গেলে বা না পারলে অযথা সময় নষ্ট না করে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যান। গণিত পরীক্ষায় মাথা ঠান্ডা রাখা খুব জরুরি।

মানসিক দক্ষতা

মোট ছয়টি টপিকের ওপর প্রশ্ন করা হয়। টপিকগুলো হচ্ছে–ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning), সমস্যার সমাধান (Abstract Reasoning), স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Space Relations), সংখ্যাগত ক্ষমতা (Numerical Ability), বানান ও ভাষা (Spelling and Language) ও যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning)। মোট ৫০টি প্রশ্ন, নম্বরও ৫০।

প্রস্তুতি ও কৌশল

- প্রস্তুতি নেওয়ার আগে বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন দেখতে হবে। বিশেষ করে ২৭তম লিখিত থেকে ৩৭তম লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন। এর সঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নগুলোও দেখে নেবেন। কিছু প্রশ্ন আছে, সংখ্যা পরিবর্তন করে রিপিট হয়।
- ভালো করার জন্য প্রতিদিন অনুশীলন করুন। যেকোনো ভালো মানের সহায়ক বই থেকে অনুশীলন করতে পারেন। অনলাইনেও অনুশীলন করতে পারেন।
- ভাষাগত যৌক্তিক বিচার অংশে সাধারণত অর্থ অনুধাবন ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, সাদৃশ্য, ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা, রক্তের সম্পর্ক বা সম্পর্ক মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন থাকে। অনুশীলন করলে আয়ত্তে আসবে।
- বিমূর্ত যুক্তি বা সমস্যা সমাধান অংশে সাধারণত চিত্র দেখে উত্তর করা বা চিত্র যুক্ত অভীক্ষা থাকে। এক্ষেত্রে চিত্রের মধ্যে মিল খুঁজে বের করতে হয়। এ ছাড়া একটি চিত্রের ভেতর অনেক ছোট চিত্র থাকে, যা খুঁজে বের করতে হয়।
- স্থানাঙ্ক সম্পর্কে দূরত্ব ও স্থান নির্ণয় করতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দিক সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা জরুরি।
- সংখ্যাগত ক্ষমতায় বিভিন্ন ধারা, বীজগণিত, পাটিগণিত, ঘড়ি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন হয়। ঘড়িসংক্রান্ত প্রশ্নে ঘণ্টা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করতে বলা হতে পারে।
- বানান ও ভাষা অংশে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের সঠিক বানান, অর্থ, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন হয়। বানান সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে এতে ভালো করা সম্ভব।
- যান্ত্রিক দক্ষতা অংশে আয়না ও পানিতে প্রতিচ্ছবি, বিভিন্ন যন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন হয়। Miror and Water Image সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা জরুরি।

ইসমাইল হোসেন
কালের কণ্ঠ ২৮ মার্চ ২০১৮

শহরের মিনতি

মো. রাকিবুল বিশ্বাস
সদস্য ১১২৬/২০১৫

একাকি বিরলে তোমারই স্মরণে,
ভাবি আমি বসে এই ভবনে।
বদ্ধ ঘরে আমি একা
জানালাটাও ছিল না খোলা,
একটু আলো বাতাসও যায় না দেখা
আটকে রেখেছি হৃদয়টাকে নয়নের জলে।

শূন্যতা নিয়ে ঘুরি যখন রাজপথে
পথটাকেও যেন হয়ে যায় কাটা!
পথে প্রান্তরে খুঁজি সবুজ-শ্যামল বাংলা
রং-বেরঙের দালান কোটায় ছাদটাও যেন আঁটা।

প্রাণহীন কৃত্রিম বৃক্ষে ফোটে ফুল,
সুবাসিত বাতাস আর তো বয় না,
প্রজাপতিরা আর তো ফুলের উপর বসে না,
সুমিষ্টি গন্ধে আর তো প্রাণ ভরে না।

প্রাণহীন শহরে বড় বড় দালান কোটা
আর দূষিত বাতাস ছাড়া কিছুই তো বয় না।
হর্ণ, মাইক, গাড়ি আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দে
কোকিলের গান আর তো শোনা যায় না।

প্রাণহীন শহরে মন আর যে থাকতে চায় না
সবুজ-শ্যামল বাংলা আর তো দেখা যায় না।

নদীর সাথে

মনওয়ার হোসেন

মেঘনা-যমুনা-রূপসার বাঁকে পদ্মার পাড়ে
মধুমতীর বুকে তিতাসের তীরে তিস্তার ধারে
চলো ভাই চলো দেশটাকে দেখি নদীর মিছিলে
মহানন্দার ঢেউ খেলে যায় বিশ্ব-নিখিলে
এই বুড়িগঙ্গার শীতলক্ষার জোয়ারের টানে
কপোতাক্ষর কূলে ঘেঁষে শেষে করতোয়া পানে
যদি যেতে চাও সুরমার সাথে বিশখালী ঘুরে
কর্ণফুলীর কল-কল্লোলে দূর বহু দূরে।

হারাবতী ছেড়ে হরিণঘাটার বুকে বেয়ে চলো
শঙ্খ-ভদ্র-ভৈরব সব রূপে ঝালোমল
কংস-বংশী-বরাক-বড়াল নাগর এখন
এপার ওপার ভাঙ্গে গড়ে তবু কেড়ে নেয় মন।
ধানসিঁড়ি থেকে কীর্তনখোলা-কচা-আত্রাই
ইছামতি হয়ে তেঁতুলিয়া ছুঁয়ে যেখানেই যাই
জলধি-কুমার-পশুর-গড়াই-গোমতীর কাছে
মালঞ্চ-মহুরী-সুগন্ধা যেনো মিলে-মিশে আছে।

রায়মঙ্গল-শীলা-শিংগমারী-পুনর্ভবার
পাশে এসে দেখো সুবর্ণার বিচিত্র বাহার
মাথাভাঙ্গা আর ডাকাতিয়া কত নদীর মালায়
গ্রাম-বাংলার গর্ব আজো দেশ-দুনিয়ায়।

[নবীন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সংখ্যা থেকে নেওয়া]

প্রকল্প সংবাদ

এইচএসসি ২০১৮ পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৬ ব্যাচের ৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ০৪ জন জিপিএ ৫ (A+) পাবার গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ২০ জন সদস্য গ্রেড A পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় পাশের হার ৯৮% । কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী সকল সদস্যকে এইচডিএফ-এর পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন!!

A+ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং
০১	আনিসা আজাদ (সদস্য নং ১২০৫)	০৩	মো. ওয়ালিদ মিয়া (সদস্য নং ১২৪৩)
০২	মোছা. মরিয়ম আক্তার (সদস্য নং ১২০৭)	০৪	মো. রাকিব হোসেন (সদস্য নং ১২৬২)

A পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা:

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং
০১	প্রত্যাশা সরকার (সদস্য নং ১২০৮)	১১	মোছা. রুমি খাতুন (সদস্য নং ১২২৩)
০২	মোছা. সুইটি বেগম (সদস্য নং ১২০৯)	১২	মোছা. খাদিজা খাতুন (সদস্য নং ১২২৫)
০৩	মোছা. তামিমা খাতুন (সদস্য নং ১২১১)	১৩	মো. সাদিকুল ইসলাম (সদস্য নং ১২৩৯)
০৪	নুসরাত জাহান জ্যোতি (সদস্য নং ১২১২)	১৪	মো. শাওন সরদার (সদস্য নং ১২৪০)
০৫	মোসা. তৃণা হক (সদস্য নং ১২১৩)	১৫	মো. ফরিদুল ইসলাম (সদস্য নং ১২৪১)
০৬	আদুরী রাণী (সদস্য নং ১২১৫)	১৬	মুসা ফারুকী (সদস্য নং ১২৪৪)
০৭	মোছা. ফাতেমা আক্তার হীরা (সদস্য নং ১২১৭)	১৭	মো. মিঠুল মিয়া (সদস্য নং ১২৪৬)
০৮	মোছা. কামরুন্নাহার কেয়া (সদস্য নং ১২১৮)	১৮	মো. আরিফুল ইসলাম (সদস্য নং ১২৪৯)
০৯	শাকিলা আক্তার (সদস্য নং ১২২২)	১৯	মো. মুন্না মন্ডল (সদস্য নং ১২৫৮)
১০	হৈমন্তী রানী (সদস্য নং ১২২৪)	২০	মো. নুর আলম (সদস্য নং ১২৬৫)

মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৮ ব্যাচের প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন

মেধা লালন প্রকল্প'র আওতায় সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদানের জন্য ২০১৮ ব্যাচের সদস্যদের প্রাথমিক বাছাই পর্ব সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৪১ জন ছাত্র ও ৪৪ জন ছাত্রী প্রাথমিক বাছাই পর্বে নির্বাচিত হয়েছে। প্রাথমিক বাছাই পর্বে নির্বাচিতদের মধ্য থেকে মোট ৬০ জন (৩০ জন ছাত্র ও ৩০ জন ছাত্রী) কে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৪ (ছাত্রী)

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	মোসা. তামিমা খাতুন ১০৮৭/১৪ গ্রাম: খোসালপাড়া (২), ডাকঘর: গোমস্তাপুর থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	অর্থনীতি, ২য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২.	লিজা আক্তার ১০৮৮/১৪ গ্রাম: উত্তর আলম নগর, ডাকঘর: চরভদ্রাসন থানা: চরভদ্রাসন, জেলা: ফরিদপুর।	অর্থনীতি, ২য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩.	চৈতী মজুমদার ১০৮৯/২০১৪ গ্রাম: পার চালনা, ডাকঘর: চালনা বাজার থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	উচ্চতর গণিত, ২য় বর্ষ সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা।
৪.	মোছা. মিনারা খাতুন ১০৯০/১৪ গ্রাম: কেতকীবাড়ী, ডাকঘর: নওদাবাস থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	অর্থনীতি, লেভেল-২ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর।
৫.	মোসা. বৃষ্টি খাতুন ১০৯১/১৪ গ্রাম: কাঁশিপুর, ডাকঘর: গোমস্তাপুর থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
৬.	মরিয়ম খাতুন ১০৯৩/১৪ গ্রাম: উত্তর হাউসনগর, ডাকঘর: চৌডালা থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	নার্সিং, ১ম বর্ষ রাজশাহী নার্সিং কলেজ।
৭.	তমালিকা বিশ্বাস ১০৯৪/১৪ গ্রাম: চালনা, ডাকঘর: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	ফার্মেসি, ৩য় বর্ষ ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি, বরিশাল।
৮.	মোসা. নুরজাহান সাথী ১০৯৫/১৪ গ্রাম: আকচা বানিয়া পাড়া, ডাকঘর: কালিগঞ্জ হাট থানা: তানোর, জেলা: রাজশাহী।	এ্যাগ্রনমি অ্যান্ড এ্যাগ্রিকালচারাল এক্সট্রেনশন লেভেল-১ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯.	সৈয়দা মাসুমা পারভীন ১০৯৭/১৪ গ্রাম: বাজার পাড়া, ডাকঘর: গোমস্তাপুর, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।
১০.	ছালমা খাতুন ১০৯৮/১৪ গ্রাম: নেফড়া, ডাকঘর: সাতদরগাহ, থানা: উলিপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম।	ফাজিল, ২য় বর্ষ সাতদরগাহ নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম।
১১.	ফারহানা খাতুন ১০৯৯/১৪ গ্রাম: নূরপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	পরিসংখ্যান, ১ম বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৪ (ছাত্রী)

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১২.	মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌসি ১১০০/১৪ গ্রাম: উত্তর সিংগীমারী, ডাকঘর: সিংগীমারী থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট ।	হিসাববিজ্ঞান, ১ম বর্ষ লালমনিরহাট সরকারি কলেজ ।
১৩.	মোসা. বিলকিস খাতুন ১১০১/১৪ গ্রাম: দোষিমানী কাঁঠাল, ডাকঘর: গোমস্তাপুর, থানা: গোমস্তাপুর জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।	বিএসএস, ১ম বর্ষ রহনপুর ইউসুফ আলী কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।
১৪.	জেসমিন খাতুন ১১০৩/১৪ গ্রাম: চালনা সবুজপল্লী, ডাকঘর: চালনা বাজার থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা ।	ইংরেজি, ২য় বর্ষ সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা ।
১৫.	মোছা. ইলোরা ইয়াসমীন ১১০৫/১৪ গ্রাম: রূপসী মুন্সী পাড়া, ডাকঘর: লালপুকুর থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর ।	কৃষি, লেভেল-১ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর ।
১৬.	মোছা. জুলেখা আক্তার ১১০৬/১৪ গ্রাম: দৌলত রসুলপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর ।	নার্সিং, ২য় বর্ষ চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ ।
১৭.	নূরজাহান আক্তার ১১০৭/১৪ গ্রাম: মন্ডলসেন, ডাকঘর: বনবাংলা থানা: মুক্তাগাছা, জেলা: ময়মনসিংহ ।	কৃষি, ২য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর ।
১৮.	মোছা. ফাল্গুনী হামিদ ১১০৮/১৪ গ্রাম: মাদারপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর ।	কৃষি, ২য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর ।
১৯.	মোছা. শ্যামলী বেগম ১১০৯/১৪ গ্রাম: নূরপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর ।	ইংরেজি, ১ম বর্ষ দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ ।
২০.	সালমা ফারিহা হিমি ১১১০/১৪ গ্রাম: মাইজবাড়ী, ডাকঘর: মাইজবাড়ী থানা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ ।	বাংলা, ১ম বর্ষ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ ।
২১.	মোছা. আয়শা সিদ্দিকা ১১১২/১৪ গ্রাম: বানুপাড়া, ডাকঘর: হারাগাছ, থানা: কাউনিয়া, জেলা: রংপুর ।	ল্যাবরেটরী মেডিসিন, ৩য় বর্ষ ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি, রংপুর ।
২২.	জান্নাতুল ফেরদৌসী ১১১৩/১৪ গ্রাম: বাগুয়া, ডাকঘর: গফরগাঁও, থানা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ ।	নার্সিং, ২য় বর্ষ ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ ।
২৩.	জান্নাতুল মাওয়া ১১১৪/১৪ গ্রাম: নুরপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর ।	গণিত, ১ম বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর ।
২৪.	মুনিয়া খান ১১১৫/১৪ গ্রাম: কলারদোয়ানিয়া, ডাকঘর: কলারদোয়ানিয়া, থানা: নাজিরপুর, জেলা: পিরোজপুর ।	নার্সিং, ২য় বর্ষ পিরোজপুর নার্সিং ইন্সটিটিউট ।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

Lucky 7 আর Unlucky 13 এ দুটি বিষয় কীভাবে এলো?

এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি এই পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে লোকমুখে প্রচলিত কিছু তথ্য থেকে ধারনা করা যায় এসব কারণে ১৩ সংখ্যাটিকে অশুভ এবং ৭ সংখ্যাটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। ১৩ সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করার পিছনে সর্বাধিক প্রচলিত ধারনা হলো–যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধের আগের রাতে একত্র খাবার খেয়েছিলেন যিশু ও ১২জন শিষ্য। মোট ১৩ জন। ঐ রাতের খাওয়াকেই বলা হয় দ্যা লাস্ট সাফার (The Last Supper) এবং সেটাই তার শেষ ভোজ। সেই থেকে ১৩ সংখ্যাটিকে অমঙ্গলজনক বলে গণ্য করা শুরু হয়। আবার যিশুকে শূলে চড়ানো হয় শুক্রবার (Good Fridaz), ৩০ খ্রিষ্টাব্দে, আর সেদিনের তারিখটি ছিল ১৩। তাই এখনো খ্রিষ্টানরা যেকোনো শুক্রবার ১৩ তারিখ হলে সেই দিনটিকে অশুভ বিবেচনা করে। এ ব্যাপারে কেউ কেউ গ্রীক পৌরাণিক কাহিনির ভালো হল্লা ভোজ উৎসবের কথাও তুলে ধরেন। ঐ ভোজ উৎসবে ১২ দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বিবাদ, শত্রুতা ও অমঙ্গলের প্রতিভূ 'লোকি' ঐ ভোজসভায় জোর করে প্রবেশ করে মোট সংখ্যাকে ১৩-তে উন্নীত করে। কিন্তু দেখা যায়, সেখানে ওই দেবতাদের প্রিয়পাত্র বেলডার নিহত হন।

৭ সংখ্যাটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক বিবেচিত করার পিছনে যে কারণগুলো লোকমুখে প্রচলিত তা হলো–৭ ইংরেজি বর্ণমালার ৭তম বর্ণ যা God-এর এ-এর সাথে সম্পৃক্ত। রংধনুর সাতটি রঙের সমাহারকে ('বেনী আসহ কলা') ইংরেজিতে বলে VIBGYOR। এখানে ৭ সংখ্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সেই প্রাচীনকাল থেকেই সাতদিনে সপ্তাহের হিসাব চালু হয়েছে। আমরা আরও জানি, বিশ্বের 'সপ্তআশ্চর্য'-এর কথা। তা ছাড়া, সাত সমুদ্র, সাত মহাদেশ এগুলো সবই ৭-এর মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ধারণায় ৭ সংখ্যাটি সৌভাগ্যের প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়েছে।

ইয়োলো জার্নালিজম কী?

হলুদ সাংবাদিকতা বলতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভিত্তিহীন রোমাঞ্চকর সংবাদ পরিবেশন বা উপস্থাপনকে বোঝায়। এ ধরনের সাংবাদিকতায় ভালো মতো গবেষণা বা খোঁজখবর না করেই দৃষ্টিগ্রাহী ও নজরকাড়া শিরোনাম দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। হলুদ সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য হলো সাংবাদিকতার রীতিনীতি না মেনে যেভাবেই হোক পত্রিকার কাটতি বাড়ানো বা টেলিভিশন চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা বাড়ানো। অর্থাৎ হলুদ সাংবাদিকতা মানেই ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেশন, দৃষ্টি আকর্ষণকারী শিরোনাম ব্যবহার করা, সাধারণ ঘটনাকে একটি সাংঘাতিক ঘটনা বলে প্রতিষ্ঠা করার

চেষ্টা করা, কেলেংকারির খবর গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা, অহেতুক চমক সৃষ্টি ইত্যাদি।

হলুদ সাংবাদিকতার জন্ম হয়েছিল সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম দুই ব্যক্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ পুলিৎজার আর উইলিয়াম রুডলফ হার্স্টের মধ্যে পেশাগত প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে। এই দুই সম্পাদক তাদের নিজ নিজ পত্রিকার ব্যবসায়িক স্বার্থে একে অপরের অপেক্ষাকৃত যোগ্য সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর্মচারীদের অধিক বেতনে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত কেলেংকারির চাঞ্চল্যকর খবর ছেপে তারা পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। পুলিৎজারের নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ও হার্স্টের নিউইয়র্ক জার্নালের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা এমন এক অরুচিকর পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে পত্রিকার বাহ্যিক চাকচিক্য আর পাঠকদের উত্তেজনা দানই তাদের নিকট মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

গীতিকাব্য কি?

গীতিকাব্য একজন কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতির সহজ, সাবলীল গতি ও ভঙ্গিমায় সঙ্গীত-মুখর জীবনের আত্ম-প্রতিফলন। এটি গীতি কবিতা নামেই সাহিত্যামোদী ব্যক্তিবর্গের কাছে সমধিক পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। গীতিকাব্য অনুভূতির বহিঃপকাশ বলে সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। কারণ কোনো অনুভূতিই দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। কিন্তু কোনো কবি যদি গীতিকবিতায় তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতিকে একান্ত আন্তরিকতার সাথে অনায়াসে দীর্ঘকারে বর্ণনা করতে পারেন, তবে তার মূল রস ক্ষুণ্ন হয় না। কবির আন্তরিকতাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বা গীতিকাব্যের একমাত্র কষ্টি-পাথর। ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্য লিরিক নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বীণাযন্ত্র সহযোগে এই শ্রেণির সঙ্গীত-কবিতা গীত হতো বলে এটি লিরিক বা গীতকবিতা নামে চিহ্নিত। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর *ভানুসিংহের পদাবলী*।

হ্যাশট্যাগ কী এবং কেন?

একসময় যখন ল্যান্ডলাইনের প্রচলন ছিল তখন টেলিফোন সেটের সব বাটনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। তখন শুধু এক থেকে নয় এবং শূন্য বাটনের সঙ্গেই আমাদের সাধারণ মানুষের পরিচয় ছিল। তবে যারা ফোন লক করে রাখতেন তাদের অবশ্য টেলিফোন সেটের হ্যাশ (#) এবং স্টার (*) বাটনের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। পরবর্তীতে এ দুইটি বাটনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যখন আমাদের দেশে মোবাইল ফোন আসে। মোবাইল ফোনে রিচার্জ করতে এবং ব্যালেন্স দেখতে এ দুইটি বাটনের প্রয়োজন হতো। তবে গত কয়েক বছরে ডায়াল করা ছাড়াও আমরা # বাটনের একটি ব্যবহার দেখছি। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তা হলো, যে কোনো ইভেন্ট বা বিষয়কে একতাবদ্ধ করতে এর ব্যবহার। প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে হ্যাশট্যাগ (#ট্যাগ) সংবলিত স্ট্যাটাস বা ছবি। অনেকেই বুঝতে পারেন না, এই স্ট্যাটাস বা ছবির পেছনে কেন আঠার মতো লেগে আছে হ্যাশ (#)। আসলে এটাকে মাইক্রোব্লগিংয়ের ভাষায় বলা হয় হ্যাশট্যাগ। এটা একই ধরনের বক্তব্যকে একীভূত করে। যেমন, একুশের বইমেলা। এখন যদি কেউ মেলা সম্পর্কে তথ্য বা কোনো বক্তব্য দিতে ব্যবহার করে # একুশের মেলা, তবে বুঝতে হবে এই রিলেটেড আরও বক্তব্য বা তথ্য আছে এই হ্যাশট্যাগে। আপনি যখন কোনো শব্দের শুরুতেই হ্যাশট্যাগ (#ট্যাগ) ব্যবহার করবেন তখন সেটি নীল বর্ণ ধারণ করবে। অর্থাৎ সেটা একটা লিংক-এ পরিণত হবে। পরবর্তীতে এই রিলেটেড সব স্ট্যাটাস বা ছবি যদি একই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে দেওয়া হয় তবে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারকারীরা সহজেই সব এক জায়গায় পাবেন। অর্থাৎ এটি সবার মতামত এক করার একটি উদ্যোগ। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়, হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের সময় ব্যবহৃত শব্দে যাতে কোনো স্পেস না থাকে। স্পেস থাকলে এটা লিংক তৈরি করতে পারে না। সাধারণত কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে হ্যাশট্যাগের ব্যবহার বেশি। ইদানীং অবশ্য এর বিভিন্ন ব্যবহার বেড়েছে। আজকাল সিনেমার প্রচারেও এর ব্যবহার ব্যাপক ভাবে হচ্ছে। আবার কেউ কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিতেও একই কাজ করেন। কেউ-বা শুধুই নিজেদের ভিতর আড্ডার জন্যও এমনটা করতে পারেন। হ্যাশট্যাগের ব্যবহার শুরু হয় মূলত মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে। পরে ২০১৩ সালের জুনে ফেসবুকেও এর ব্যবহার শুরু হয়। এখন গুগল প্লাসেও এর ব্যবহার দেখা যায়। হ্যাশট্যাগের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে যায় যে, শেষপর্যন্ত 'হ্যাশট্যাগ' শব্দটি ২০১৪ সালের জুন মাসে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতেও জায়গা করে নেয়।

হঠাৎ করে কেউ অজ্ঞান হলে কী করবেন?

রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে কত ঘটনা ঘটে। যে কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে যে কেউ। এমনকি আপনার অনেক আপনজন। এ অবস্থায় ঘাবড়ে না গিয়ে প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপ নিলে অনেক সময় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা এড়ানো যায়।

কেউ কেউ হঠাৎ করে আবার কেউ কেউ ধীরে ধীরে অজ্ঞান হতে পারে। অনেকে অল্প সময়ের জন্য, কেউ-বা অনেকক্ষণ অজ্ঞান থাকতে পারে। অজ্ঞান রোগী গা ঝাঁকুনি বা উচ্চ শব্দে বা ব্যথায় সাড়া নাও দিতে পারে। অনেকের শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমনকি, নাড়ির গতিও কমে যেতে পারে। এরকম হলে তাড়াতাড়ি, সবসময় চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায় এমন হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

অজ্ঞান হওয়ার কারণগুলো কী কী?

অনেক কারণে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে যে কেউ। কিছু কিছু সাধারণ কারণ হলো :

১. সড়ক দুর্ঘটনা
২. অনেক রক্তক্ষরণ
৩. বুকে বা মাথায় অনেক জোরে আঘাত পেলে
৪. ওষুধের ডোজ বেশি হয়ে গেলে
৫. এলকোহল পয়েজিং হলে
৬. রক্তে সুগার বা চিনির পরিমাণ কমে গেলে
৭. ব্লাড পেশার কমে গেলে
৮. সিনকোপ (মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে)
৯. পানিশূন্যতা হলে
১০. হার্টের সমস্যা হলে
১১. নিউরোলজিক সিনকোপ (খিচুনি, ট্রানজিয়েন্ট ইশকেমিক অ্যাটাক
১২. একটানা অনেকক্ষণ একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে
১৩. খুব জোরে জোরে শ্বাস নিলে, ইত্যাদি।

করণীয় কী?

১. প্রথমেই দেখতে হবে, শ্বাস আছে কিনা? যদি থাকে, চিত করে শোয়াতে হবে।
২. শোয়ানোর পর, দুই পা ১২ ইঞ্চি উপরে তুলে রাখতে হবে, যাতে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বাড়ে।
৩. টাইট কাপড় পরে থাকলে, খুলে দিতে হবে, বিশেষ করে বুকের, গলার আর কোমরের।
৪. ঘাড়ের নিচে উঁচু কিছু রেখে, মাথা নিচে নামিয়ে, থুতনি উপরে রাখতে হবে, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলে বাধা তৈরি না হয়।
৫. শ্বাস বন্ধ থাকলে, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে।

যদি শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক থাকে আর ৩ মিনিটের মধ্যে জ্ঞান না ফিরে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের শরনাপন্ন হতে হবে। আর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে সাথে সাথে নিকটস্থ ভালো চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। অনেক সময় রক্তে সুগার বা চিনি কমের কারণে অজ্ঞান হতে পারে। তখন সাথে সাথে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবার দিতে হবে।

কেউ অজ্ঞান হলে কখনই যা করবেন না :

১. অজ্ঞান রোগীকে খাবার বা পানীয় দিবেন না।
২. একা ফেলে কোথাও যাবেন না।
৩. বালিশ মাথার নিচে রাখবেন না।
৪. অজ্ঞান রোগীর মুখে বা গালে চড় থাপ্পড় মেরে জাগানোর চেষ্টা করবেন না।

নবীন

ষোড়শ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিন্টু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৯৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন